মানুষ শরৎচন্দ্র

পরেশ ঘোষ

॥ পরিবেশক ॥

নির্মল পুস্তকালয়
শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-৭০০০১২

সাহা পুস্তকালয়
শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী মীরা ঘোষ

ব্লক নং—বি ১, ফ্ল্যাট নং—৭

গভঃ হাউসিং এস্টেট্

করিম বক্স রো

কলিকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ :

রথযাত্রা

উনিশশে জুন, উনিশশো উনত্রিশ

(শরৎজন্মশতবর্ষ)

প্রচ্ছদ :

শ্রীশম্ভু চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

৬, শিবু বিশ্বাস লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য—আট টাকা

॥ উৎসর্গ ॥

পরিণত অভিজ্ঞতার আলোকে
যাঁর মানবিকতাবোধ ও সূক্ষ্ম
শিল্পানুরাগ আমাকে
মুগ্ধ করেছে,
পরম বন্ধু
সেই
সুনীলকুমার দত্তকে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জী
সংকলক : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৭৬ দেবানন্দপুরের (হুগলি) এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম (১৫ই সেপ্টেম্বর)। বঙ্গাব্দ ১২৮৩, ৩১ ভাদ্র। পিতা—মতিলাল। মাতা-—ভুবনমোহিনী। শরৎচন্দ্র জ্যেষ্ঠ।

১৮৮১ গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠশালায় ভর্তি। এক বৎসর পরে পরিবারের সঙ্গে বিহারের ডিহিরিতে গমন।

১৮৮৬ পিতার চাকরি শেষ হলে ডিহিরি থেকে ভাগলপুরে পিতার সহিত প্রত্যাবর্তন। এখানে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে ভর্তি।

১৮৮৭ ছাত্রবৃত্তি পাশ। তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি।

১৮৯০ দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন। হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি। ১৮৯৩ সালে যখন ২য় শ্রেণীর (ক্লাস নাইন) ছাত্র তখন সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। দারিদ্র্যের জন্যে কিছুদিন পড়া বন্ধ। পরে পুনরায় ভাগলপুরে গিয়ে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (বর্তমানের ১০ম শ্রেণী) ভর্তি।

১৮৯৪ মাতুলালয় ভাগলপুব থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। 'শিশু' নামক হাতে লেখা মাসিক পত্রের পরিচালনা।

১৮৯৫-৯৬ তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে ভর্তি। মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু (সেপ্টেম্বর)। পরীক্ষার ফি সংগৃহীত না হওয়ায় এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

১৮৯৬-৯৯ বনেলী এস্টেটে কিছুদিনের জন্য চাকরি গ্রহণ। ভাগলপুরে আদমপুর ক্লাবে যোগদান। অভিনয়, খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা ও গান-বাজনায় মেতে ওঠেন।

১৯০১ ভাগলপুর থেকে যোগেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'ছায়া' নামে হাতে লেখা পত্রিকার প্রকাশ। শরৎচন্দ্র উক্ত পত্রিকার সঙ্গে জড়িত এবং অন্যতম লেখক। 'ছায়া'য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্রের গৌরব'। St. C. Lara [(St.=শরৎ, C=চট্টোপাধ্যায়, এবং Lara=ন্যাড়া (তাঁর ডাক নাম)] ছদ্মনাম গ্রহণ। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ। মজঃফরপুরে অবস্থিতি, প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯০২ মজঃফরপুরে অবস্থানকালে পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভাগলপুরে গমন। অর্থের সন্ধানে কলকাতায় আগমন। মাসিক ৩০ টাকায় আত্মীয় লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট কর্ম গ্রহণ।

১৯০৩ 'মন্দির' নামক গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরণ এবং প্রথম পুরস্কার লাভ। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হয় (১৩১০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে)। রেঙ্গুনে মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গমন (জানুয়ারী)। বর্মা রেলওয়েতে চাকরি গ্রহণ।

১৯০৫ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩০ জানুয়ারী)। মাসীমা অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনের বাস উঠিয়ে দিলে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গভর্নমেন্ট হাউসের ওভারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ওঠেন। রেলওয়ের চাকরি পরিত্যাগ করে বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (জুলাই)। কিছুদিন পরে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করে পেগুতে পেগু-ডিভিশনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৫০ টাকা বেতনে চাকরি গ্রহণ। আড়াই মাস এই অফিসে চাকরি করার পর বেকার হন।

১৯০৬ পুনরায় বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস্ অফিসে চাকরি গ্রহণ (এপ্রিল)। শান্তিদেবীকে বিবাহ। ছবি আঁকার চর্চা, প্রথম ছবির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী'।

১৯০৭ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশ (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪)। ইহাই স্বনামাঙ্কিত প্রথম রচনা।

১৯০৮ স্ত্রী শান্তিদেবীর প্লেগে মৃত্যু।

১৯১০ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং মেদিনীপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস অধিকারীর (চক্রবর্তী ?) কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ। স্ত্রীসহ পুনরায় বর্মায় গমন।

১৯১২ কলিকাতায় আগমন। (ডিসেম্বর) "যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সহিত পরিচয়। যমুনায় 'বোঝা"র শুভাগমন।

১৯১৩ যমুনায় নিয়মিত রচনা দানের স্বীকৃতি। "রামের সুমতি", "পথ-নির্দেশ" প্রকাশ, "বড়দি" প্রকাশ (সেপ্টেম্বর)। ভারতবর্ষে "বিরাজ-বৌ"।

১৯১৪ যমুনার সম্পাদক (জুন) "বিরাজ-বৌ" প্রকাশ (মে)। "বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প" প্রকাশ (জুলাই), "পরিণীতা" (আগস্ট), "পণ্ডিতমশাই" (সেপ্টেম্বর) প্রকাশ।

১৯১৫ যমুনার সম্পর্ক ত্যাগ, ' ভারতবর্ষ" পত্রিকায় যোগদান। 'মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ (ডিসেম্বর)।

১৯১৬ "পল্লীসমাজ" (জানুয়ারী), "চন্দ্রনাথ" (মার্চ) প্রকাশ। অসুস্থ অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরাবরের জন্য এদেশে আসেন (১১ই এপ্রিল)। "বৈকুণ্ঠের উইল" (জুন), "অরক্ষণীয়া" (নভেম্বর) প্রকাশ। হাওড়ার বাজে শিবপুরে বসবাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

১৯১৭ "শ্রীকান্ত" ১ম পর্ব (ফেব্রুয়ারী), "দেবদাস" (জুন), "নিষ্কৃতি" (জুলাই), "কাশীনাথ" (সেপ্টেম্বর), "চরিত্রহীন" (নভেম্বর) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯১৮ "স্বামী" (ফেব্রুয়ারী), "দত্তা" (সেপ্টেম্বর), "শ্রীকান্ত" ২য় পর্ব (সেপ্টেম্বর) গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯১৯ "বসুমতী" কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনা।

১৯২০ "ছবি" (জানুয়ারী), "গৃহদাহ" (মার্চ) গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯২১ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯২২ "শ্রীকান্ত" ১ম পর্ব, ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

১৯২৩ "নারীর মূল্য" (এপ্রিল), "দেনা-পাওনা" (আগস্ট) গ্রন্থের প্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "জগত্তারিণী" স্বর্ণপদক দান।

১৯২৪ "নববিধান" (অক্টোবর) গ্রন্থ প্রকাশ। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে "রূপ ও রঙ্গ" নামক পত্রিকার সম্পাদনা (অক্টোবর)।

১৯২৫ কাশীতে বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর নবম বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব (২৫ জানুয়ারী)। মুন্সিগঞ্জে (ঢাকা) অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি (১১-১২ এপ্রিল)। পানিত্রাসে গৃহ-নির্মাণ।

১৯২৬ "হরিলক্ষ্মী" (মার্চ), "পথের দাবী" (আগস্ট) গ্রন্থ প্রকাশ। শিলচর ছাত্রসংঘ কর্তৃক মানপত্র দান। মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু।

১৯২৭ "শ্রীকান্ত" ৩য় পর্ব (এপ্রিল), "ষোড়শী" [দেনা পাওনার নাট্যরূপ] (আগস্ট), "বামুনের মেয়ে" গ্রন্থ প্রকাশ। শিবপুর সাহিত্য সংসদ কর্তৃক সম্বর্ধনা (১৩ ফেব্রুয়ারী)। "শ্রীকান্ত" ১ম পর্বের ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশ, রমাঁ রলাঁ কর্তৃক বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সম্মান দান।

১৯২৮ "রমা" [পল্লীসমাজের নাট্যরূপ] গ্রন্থ প্রকাশ। ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী কর্তৃক সম্বর্ধনা।

॥ এই লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

- আজব-বিচার (২য় সংস্করণ)
- জন্তু (২য় সংস্করণ)
- মানবী ও মুদ্রা
- বন্দরের নিঃশ্বাস (যন্ত্রস্থ)
- পৃথিবী জংশন (ঐ)
- তিনটি একাঙ্ক (ঐ)

  ১। ওয়েডিং রুম,

  ২। নষ্ট ফসল,

  ৩। সমুদ্র গর্জন।

নির্দেশনার জন্য নাট্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভূমিকা

শরৎজন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দেশের সর্বত্র এই অপরাজেয় কথাশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ আমাদের দেশে এত তোড়জোড় করে পালিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

শরৎচন্দ্র কোন আত্মজীবনী লেখেন নি। "শ্রীকান্ত"কে শরৎ-চন্দ্রের আত্মজীবনী ভেবে নিয়ে অনেক পাঠক-পাঠিকা এখনও পর্যন্ত তৃপ্ত আছেন। কিন্তু শরৎবাবুকে একথা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নিজেই বলেছেন, "শ্রীকান্ত আমার একখানা উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়।" শরৎবাবুর মৃত্যুর ঠিক পরে (১৩৪৪ সালে) বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং সাহিত্য-প্রতিভার নানা দিক নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে সমস্তই আংশিক ও অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবনী-গ্রন্থ লিখবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই পরস্পর-বিরোধী তথ্যে পূর্ণ। প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে বলা কিছু গল্প ও বর্ণনা, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিছু চিঠিপত্র এবং সমসাময়িক কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষের পূর্বস্মৃতিকে।

এই অমর সাহিত্যিকের জ্বালাময় জীবন নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে আমাকেও ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। পরম বিস্ময়ে অনুভব করেছি মানুষ শরৎচন্দ্রের জীবনে এমন ঘটনা

ব কমই ঘটেছে, যাকে স্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শরৎবাবু নিজেই বলেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির শতকরা নব্বুই ভাগ বাস্তব এবং দশভাগ সাহিত্যের খাতিরে রঞ্জিত। এই সাধারণ বাস্তব চরিত্রগুলি, অনুভূতি ও দৃষ্টির যে গভীরতায় বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়েছে,—সেই শক্তিই শরৎচন্দ্রকে অমরত্ব এনে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের হৃদয়াবেগ ছিল অত্যন্ত প্রবল, অন্তঃকরণ নারীর মত কোমল ও স্পর্শকাতর, অথচ অনুভূতি গভীর ও স্বচ্ছ।

তাঁর চরিত্রের এই চরমমুখিতা, তাঁর জীবনের অনেক জ্বালা ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। ডিসরেইলির ভাষায় বলা যেতে পারে ;—"I am certain there is no greater misfortune than to have a heart which will never grow old."

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত হৃদয়ের তারুণ্যের এই মর্মস্পর্শী জ্বালায় শরৎচন্দ্র জর্জরিত হয়ে গেছেন। মৃত্যুশয্যায় তাঁর শেষ কটি কথা ছিল,—"আমাকে দাও। আমাকে আরো—আরো দাও।"

শরৎচন্দ্রের জীবন তাঁর সৃষ্ট গল্প উপন্যাসগুলির চেয়েও বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। তাঁর জীবনে নাটকীয় উপাদানের ছড়াছড়ি। তাই এই নাটক লিখতে আমাকে কল্পনার আশ্রয় খুব কমই নিতে হয়েছে।

এই নাটক রচনায় যে সমস্ত সাহিত্যিকদের রচনাবলীর সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে, তাঁরা কেউ বর্তমান, কেউ বা পরলোকগত। গোপালচন্দ্র রায়, অবিনাশ ঘোষাল, পুলকেশ দে সরকার, নরেন্দ্র

দেব, গিরীন সরকার, যোগীন সরকার, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, জলধর সেন, দিলীপকুমার রায় ও রাধারাণী দেবী প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকাদের আমার অবনত মস্তকের প্রণাম জানাই। এঁদের বিভিন্ন রচনাকে মূলধন করেই আমার এই নাটকটি লিখেছি।

বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত শরৎচন্দ্রের একটি ধারাবাহিক জীবনপঞ্জী এই নাট্যগ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। রচনায় সাহায্যের জন্য বহু পুস্তক তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। রচনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত আর যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীল দত্ত, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ সেন, বিনয় মিত্র, বিষ্ণুপদ মিত্র, রামরঞ্জন কর, নন্দদুলাল কুণ্ডু, শৈল চক্রবর্তী, সুকেশ মুখোপাধ্যায়, রেখা কর, মানা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আন্তরিক সহৃদয়তা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে "সুখ-স্মৃতি" হয়ে থাকবে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক শ্রীনবেন্দু চট্টোপাধ্যায় নাটকটি রচনার সময়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং প্রার্থনা করি নিজ কর্মজীবনে তিনি যেন সার্থকতার শীর্ষে উন্নীত হন।

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী পপিতা গাঙ্গুলী শুধু যে তাঁর সুঅভিনয়ে নাটকটির মঞ্চ-সাফল্য এনে দিয়েছেন, তাই নয়, প্রকাশনার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে আমাকে অনন্ত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

রঙ্গতীর্থ ও প্রিমরোজ ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাগণ যাঁরা দিনের পর দিন অভিনয় করে এনে দিয়েছেন "মানুষ শরৎচন্দ্রে"র মঞ্চ-সাফল্য তাঁদের জন্য রইল আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা।

এই নাটক যদি কোন সংস্থা অভিনয় করেন তাহলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করলে আমি নির্দেশনা বা অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবো।

রথযাত্রা—
উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রীস্টাব্দ

পরেশ ঘোষ
ব্লক—বি ১, ফ্ল্যাট নং—৭
গভঃ হাউসিং এস্টেট্,
করিম বক্স রো,
কলিকাতা-৭০০০২

অতীতে যাঁরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন :

"মানুষ শরৎচন্দ্র"

চরিত্র	পরিচয়	রূপ দিয়েছেন
শরৎচন্দ্র—	অমর কথাশিল্পী	পরেশ ঘোষ
ঐ (ছোট)	"	স্বপন চৌধুরী, পরে অনীশ দাস।
হরিহর চক্রবর্তী—	রেঙ্গুনে মেকানিক	প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে দেবদাস চট্টোপাধ্যায়।
যুধিষ্ঠির—	ঐ	শৈলেন ভট্টাচার্য, পরে লক্ষ্মী মান্না।
ঘোষাল—	রেঙ্গুনে ধনী লোক	কমল মালাকার, পরে মানা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শীতলচাঁদ—	ঐ শ্রমিক	প্রফুল্ল দত্ত, পরে সমর ভড়।
ডি'কস্টা—	ঐ ঐ	পরিতোষ সেন, পরে সরোজ চট্টোপাধ্যায়।
গিরীন সরকার—	রেঙ্গুনে শিল্পপতি	জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।
ভোলা	শরৎচন্দ্রের চাকর	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে শিবশম্ভু ঘোষ।
কুমার বাহাদুর—	বনেলী এস্টেটের জমিদার	প্রশান্ত ভট্ট, পরে সরোজ চট্টোপাধ্যায়।
শৈলভূষণ—	শরতের বন্ধু	শৈল চক্রবর্তী, পরে বিবেকানন্দ মজুমদার।

চরিত্র	পরিচয়	রূপ দিয়েছেন
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—	সাহিত্যিক	পরিতোষ সেন, পরে মানা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কুমুদ রায়চৌধুরী—	ঐ	লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে আশীষ সরকার।
অক্ষয় সরকার—	ঐ	প্রফুল্ল দত্ত, পরে সরোজ দাস।
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—	ঐ	সুনীল দত্ত, পরে প্রবোধ ভট্টাচার্য ও গণেশ হালদার।
সুরেশ সমাজপতি—	ঐ	সুরেশ সরকার, পরে দুলাল দাস।
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—	ঐ	জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পরে দিলীপ দাস (বাবু)।
দিলীপকুমার রায়—	ঐ	বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরে দোলগোবিন্দ দাস।
রাজু—	শরতের বন্ধু	অজয় চট্টোপাধ্যায়, পরে রামরঞ্জন কর ও রঞ্জন দাস।
গঙ্গাযাত্রী —	বৃদ্ধ	শৈলেন ভট্টাচার্য, পরে শিবশম্ভু ঘোষ।
আলুওয়ালা—	ছদ্মবেশী বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী	বিষ্ণুপদ মিত্র, পরে রাসবিহারী দে ও সতীশ দাস।

চরিত্র	পরিচয়	রূপ দিয়েছেন
জ্ঞানেন্দ্র রায়চৌধুরী—	সমাজপতি	সুনীল দত্ত।
মোহিনী ঘোষাল—	জমিদার	ভবান বাগচী, পরে লাল-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুর্লভ মণ্ডল—	গ্রামবাসী	গোবিন্দ ভট্টাচার্য।
কেষ্ট বাগ—	ঐ	সত্যনারায়ণ সিং।
সুরেন গাঙ্গুলী—	সাহিত্যিক	বিনয় মিত্র, পরে আশীষ সরকার।
হরি পাখিরা—	গ্রামবাসী	কমল মালাকার।
দারোগা—	বাগনান থানার	জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।
S.D.P.O.—	উলুবেড়িয়ার পুলিশ অফিসার	প্রশান্ত ল, পরে সরোজ চট্টোপাধ্যায়।
পুলিশ—	ঐ	নারসিং প্রসাদ।
শান্তি—	শরৎচন্দ্রের প্রথমা পত্নী	পপিতা গাঙ্গুলী।
মোক্ষদা—	ঐ দ্বিতীয়া পত্নী	সবিতা মুখোপাধ্যায়।
বাইজী—	পতিতা	বুলা দত্ত।
নৃত্যে—		নমিতা ঘোষ (গাঙ্গুলী)

প্রযোজক সংস্থা

রঙ্গতীর্থ ও প্রিমরোজ ক্লাব (শ্রীরামপুর)

আবহ সঙ্গীত

"মডার্ন আর্টিস্ট" (বিলি বাবু ও বিশু বাবু)

মঞ্চ

১। রংমহল থিয়েটার ২। রবীন্দ্র ভবন (শ্রীরামপুর) ৩। রবীন্দ্র ভারতী (অবন মঞ্চ) ৪। সাঁকরাইল ব্লক কংগ্রেস, শরৎশতবার্ষিকী সমিতি।

পোষাক-পরিচ্ছদ

"মঞ্চরূপা" ও বিশ্বাস অ্যাণ্ড কোং (শ্রীরামপুর)

মেকআপ

সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। শংকর ও সুধীর (বিশ্বাস কোং)

শব্দ ও আলো

রামপদ মাঝি

নির্দেশনা

পরেশ ঘোষ

মানুষ শরৎচন্দ্র

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করে একখানি জাহাজ এগিয়ে আসছে। তীব্র স্বরে কেঁপে কেঁপে বেজে চলেছে জাহাজের বাঁশী। ক্রমে আরোহীদের কোলাহল স্পষ্ট এবং স্পষ্টতর হয়। আরোহীদের কোলাহল ছাপিয়ে বজ্রনির্ঘোষে প্রচারিত হয় ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী—

"Attention please. Passengers, Attention please! Attention please. Passengers, we now approach the Port of Rangoon. Rangoon is ahead. Passengers are requested to pack-up and get ready for dis-embarkment.

যাত্রীদের মধ্যে নবোউদ্যমে কোলাহল শুরু হ'ল। আবার ঘোষিত হল,—

রেঙ্গুন সিটিমে "প্লেগ" কা বিস্তার হুয়া হ্যায়। ডেক্‌কা পেসেঞ্জার লোগ এককাট্টা লাইন মে খাড়া হো যাইয়ে। উন্ লোগোকো চেক আপ কা লিয়ে কোয়ারিনটাইন মে যানে পড়ে গা।

Passengers, Attention please. Attention please passengers.

ঘোষণাকে ছাপিয়ে প্রচণ্ড কোলাহল এবং ভয়ব্যাকুল

চীৎকার শোনা যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে জাহাজটি রেঙ্গুন বন্দরে নোঙর করলো। লাইটহাউসের লাল ও নীল আলো জ্বলে জ্বলে বন্দরটিকে রহস্যময় করে তুলেছিলো। নিরবচ্ছিন্ন কোলাহলের মধ্যেই জাহাজ থেকে পাটাতন ডকে নেমে এলো এবং লাইন দিয়ে যাত্রিরা নামতে লাগলো। ধীবে ধীরে মঞ্চেব আলো স্তিমিত হতে হতে এক সময় নিভে গেল। শুধু মাত্র সমুদ্রের ঢেউগুলো বন্দরের জেটিতে আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। অন্ধকারে একসময়ে ঢেউয়ের শব্দ বিলীন হলো। দূরে প্যাগোডাব ঘণ্টাধ্বনী ও মুরগীর ডাকের সংগে সকাল হ'লো। ধীরে ধীরে মঞ্চে আলো ফুটে উঠলো। দেখা গেল, একটা কাঠের দোতলা বাড়ী। সামনে একটা চাতাল। বাড়ীতে ছোট ছোট পায়রার খোপের মত ঘর। একটা ঘরে একটা ভাড়াটে। ভাড়াটেরা সকলেই নানা কলকারখানার ও ডক ইয়ার্ডের শ্রমিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক রেঙ্গুন শহর থেকে দুমাইল দূরের বোটাটাং অঞ্চলের এই কুলী ব্যারাকে বাস করে। ছুটির দিনের সকাল। নামাবলি গায়ে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে প্রবেশ করে। তার হাতে একটা মালা ও কমণ্ডলুতে জল। বাড়ীর সামনে বাঁধান তুলসী গাছে মালাটাকে পরিয়ে দিয়ে, কমণ্ডলু থেকে তুলসী গাছের মাথায় জল ঢালে। তার মন্ত্রোচ্চারণ ক্রমেই স্পষ্ট ও উদাত্ত হয়। হঠাৎ একটা ঘরের দরজা খুলে যায় এবং একটি লোক বাটি থেকে খানিকটা জল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে আবার দরজা বন্ধ করে দেয়।

জলের ছিটে ব্রাহ্মণের গায়ে লাগতেই তার মন্ত্রপাঠ বন্ধ

হয়ে যায়। খানিকক্ষণ কট্‌মট্‌ করে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে, বন্ধ দরজায় ঘা মারে। ব্রাহ্মণের নাম হরিহর চক্রবর্তী।]

হরিহর। এই যুধিষ্ঠির, যুধিষ্ঠির। শালা সুমুন্দির পো, সকল বেলায় এঁটো জল দিলি গায়ে। শালার জাতের ঠিক নেই। এখানে এসে সব শালাই উঁচু জাত আর ভদ্দরলোক বনে যায়। এই যুধিষ্ঠির, যুধিষ্ঠির, শালা দরজা খোল।

যুধিষ্ঠির। খুলুছি খুলুছি। এ পরি ধক্কা দেউচ্ছন্তি কাইকি? মু, কড় দেখি পকাইছি? মু দরজা খুলি পকাইছি, হুয়েত আপনাংকড় দেহরে পড়িলা।

হরি। দেহরে পড়িলা। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছিস, হারামজাদা।

যুধি। গালি দিবে নাই কহুছি। মু তো বারবার কহুছি আপনাংকড় দেখি পারিনাই, দেখি পারিনাই, দেখি পারিনাই।

হরি। দেখ্‌তে পাসনা কেন রে শালা। চোখে কি ছানি পড়েছে?

যুধি। দেখনতু শড়া কহিবেনি।

হরি। তবে কি বলব।

যুধি। মনুষ্য।

হরি। বন মনুষ্য।

যুধি। পুনি গালি দেউছন্তি।

হরি। বেশ করবো। গাল দেবো। শালা, শালা, শালা।

যুধি। তু শড়া, তু শড়া, তু শড়া।

[হরিহর ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের চুলের মুঠি ধরে। দুজনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। নিজের নিজের দরজা খুলে বস্তির অন্যান্য ভাড়াটেরা এসে হাজির হয়। সকলে চেঁচামেচি করে কিন্তু কেউই ওদের ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে না। যুধিষ্ঠির ততক্ষণে হরিহর চক্রবর্তীর বুকে চেপে বসেছে, আর গুনে গুনে ঘুসি মারছে। মাতাল ডি'কস্টা ঘুসি গুন্‌ছে, One, two, three—

হরিহরের চোখ ততক্ষণে কপালে ওঠার দাখিল। হরিহরের মেয়ে শান্তি চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে। সকলকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে চুলের মুঠি ধরে যুধিষ্ঠিরকে টেনে তোলে। সকলে সরে যায়। যুধিষ্ঠির ক্যাল ক্যাল করে শান্তির মুখের দিকে তাকায়। ডি'কস্টা গুনে চলেছে four, five, six, seven—হঠাৎ তাকিয়ে দেখে যুধিষ্ঠিরের চুলের মুঠি ধরে তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চলেছে শান্তি। জনতা তার পিছনে। হরিহর তখনো অজ্ঞান হয়ে তুলসী তলায় পড়ে।]

ডি'কস্টা। You Shante! where do you take him. ওকে ছেড়ে ড্যাও। Let him finish a dozen of blows!

[শান্তি ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার একটা বন্ধ দরজায় ঘা মারছে। "দাদাঠাকুর, দরজা খোল, দাদাঠাকুর।" বন্ধ দরজা খুলে একজন যুবক সামনে এসে দাঁড়াল, তার ঘুম তখনো ভালো করে ভাঙেনি। যুবকের নাম শরৎচন্দ্র।]

শরৎ। কিরে শান্তি, এই সকালবেলাতেই আবার কি হুজ্জুতি সুরু করেছিস্‌।

শান্তি। হুজ্জুতি আমি সুরু করেছি? আমার বাবাকে মেরে ফেলছিল এই যুধিষ্ঠির।

শরৎ। মেরে ফেলছিল? বলিস কি? যুধিষ্ঠির, সাতচড়ে যার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না, সে মেরে ফেলছিল তোর বাবাকে?

যুধি। এ সবু মিথ্যা কথা দাদাঠাকুড়।

[তার কথা শেষ হয় না, সকলে গর্জন করে তাকে থামিয়ে দেয়। যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে শরৎচন্দ্র তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। ডি'কস্টা তখনো হরিহরের মাথাটা কোলে ক'রে বসে আছে। শরৎচন্দ্র তখনো হরিহরকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়।]

শরৎ। কি ব্যাপার? ঠাকুর মশাই কি অজ্ঞান হ'য়ে গেছে নাকি?

ডি'কস্টা। Yes, still senseless! only six blows! ব্যাস, সেন্স হারিয়ে গেলো। মাথায় water ডি ডিলো। But—

[শান্তি ছুটে এসে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।]

শান্তি। বাবা! বাবা চোখ খোল। দাদাঠাকুর, আমার বাবা যে চোখ খুলছে না।

[শরৎচন্দ্র ততক্ষণে নিজের ঘরে গিয়ে হোমিওপ্যাথির বাক্স বার করে এনেছে।]

শরৎ। এই একদাগ "আরনিকা" খেয়ে ফেলুন তো গায়ের ব্যথা মরবে।

[কাগজের পুরিয়া থেকে হরিহরের মুখে ঔষধ ঢেলে দিলো।]

শরৎ। কি বাবা যুধিষ্ঠির অনেক কীর্তি তো করলে? একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি করে জবাব দেবে?

যুধি। মু যুধিষ্ঠির অছি। মু কেতে বেড়ে মিছা কথা কহে না।

শরৎ। তাও তো বটে। তুমি তো যুধিষ্ঠির। মিথ্যা কথা তুমি বল না। তা বাবা মারপিঠ করাতো তোমার ধাতের বাইরে। হঠাৎ তুমি ঠাকুর মশাইকে মেরে বসলে কেন?

যুধি। মু আগে মারি নাহি। ঠাকুড় আগে মারিছন্তি।

শরৎ। আবার মিথ্যা কথা বলছ?

যুধি। ঝুট কহুছি কহুটি। সকাড়ে গোটে বাটিরে পানি পোকড়িছি। সে পাহ ঠাকুড় মতে শড়া কহিল।

হরিহর। আবার মিথ্যা কথা বলছিস, শালা।

শরৎ। একি, একি? ঠাকুর মশাই, আপনি এখনো যুধিষ্ঠিরকে শালা বলছেন।

হরিহর। স্নান করে তুলসী তলায় জল দিচ্ছি, এমন সময় এঁটো জল গায়ে ঢেলে দিলে কি পূজো করবো?

শরৎ। যুধিষ্ঠির, কাল কখন ফিরেছো কারখানা থেকে।

যুধি। সন্ধ্যাবেড়ে ফেরিছি। তা পরে ঠাকুড় ঘরে বসি টিকে—"ইয়ে" করুথিলি।

শরৎ। ইয়ে করছিলে, না মদ্যপান করছিলে। তা মদ্যপান শেষ করে কত রাত্তিরে শুয়েছিলে?

যুধি। রাত্তি দুইটারে।

শরৎ। ঠাকুর মশাই! আপনারি ঘরে বসে যে লোকটা রাত দুটো অবধি মদ্যপান করলো, অতি প্রত্যুষে যে তার কিঞ্চিৎ নেশা তখনো বিদ্যমান থাকতে পারে এটা আপনার মত জ্ঞানী লোকের সহজেই ভেবে নেওয়া উচিত ছিল।

হরি। তাইবলে গায়ের উপর জল ঢেলে দেবে।

শরৎ। গায়ে ঢালেনি। ঢেলেছিলো মাটিতে। আপনার গায়ে কিঞ্চিৎ ছিটে পড়েছিল। আর সেই অপরাধে আপনি কাল রাত দুটো পর্যন্ত যে আপনার ঘরে আপনারই সঙ্গে আড্ডা, ইয়ার্কি, ভালবাসাবাসি করে মদ খেলো, তাকে আদর করে শালা বলে ফেললেন?

হরি। তা ছাড়া আর কি বলবো?

শরৎ। কিছু বলার নেই। ভালই করেছেন। আত্মীয়তা করেছেন। এই শান্তি, এদিকে আয়।

[শান্তি নড়ে না, শরৎ ধমকে ওঠে।]

আয় বলছি।

[শান্তি এসে তার কাছে দাঁড়ায়।]

তোর যুধিষ্ঠির মামাকে প্রণাম কর।

শান্তি। ইস্। ও আবার আমার মামা হোল কবে থেকে?

শরৎ। আজ থেকেরে মুখপুড়ি। তোর বাবার শালা হলে, তোর মামা হয় না? তোর মা বেঁচে থাকলে আদর করে ওকে ভাইফোঁটা দিতো।

[সকলে হো হো করে হাসতে থাকে। শরৎচন্দ্র ধমকে ওঠে—]

শরৎ। চুপ কর। হাসতে লজ্জা করে না। মদ খেয়ে গলা জড়াজড়ি করে আড্ডা মারতে পারো—আর সুস্থ মাথায় প্রতিবেশীকে ভাই বলতে পারো না।

[সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।]

ডি'কস্টা। In that case, we should always keep ourselves engaged in drinking!

শরৎ। As you do!

ডি'কস্টা। That's right!

শরৎ। তবে তাই করো। সুস্থ মাথায় যদি মানুষ চিনতে না পারো, সেও ভালো; কিন্তু সকালে উঠেই নিজের ভাইকে আর শালা, শূয়োরের বাচ্চা বলো না।

[শরৎচন্দ্র দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোয়। হঠাৎ থেমে আবার বলে—]

কিরে শান্তি! আজ কি রান্নাবান্না করবি না? আমার অফিস নেই?

শান্তি। আজ তো রবিবার। রবিবারেও কি তোমার অফিস সুরু হয়ে গেলো এখন থেকে?

[শরৎচন্দ্র এগিয়ে আসে এবং লজ্জিত হয়।]

শরৎ। ঠিক বলেছিস। আজ তো রবিবার। আমারও যুধিষ্ঠিরের মতই দশা হয়েছে বুঝলি? কাল রাত্তিরে বাথিন আর

চাটুজ্জের সঙ্গে গিয়েছিলাম এক মেয়েছেলের ঘরে মদ খেতে। গিয়ে দেখি সে বেটীর 'পকস্' হয়েছে। চাটুজ্জ্যে আর বাথিন তো ভয়েই পালিয়ে গেল। আমিও বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনি মেয়েছেলেটি জল চাইছে। ওরই ঘরের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে মেয়েটাকে দিলাম।

শান্তি। তোমায় কি ভিমরতি হয়েছে? একে তো বেশ্যা মেয়েছেলে, তার ওপর মায়ের দয়া হয়েছে। তাকে তুমি ছুঁলে? জল দিলে ?

শরৎ। তা কি করবো? চাটুজ্জ্যের মেয়েছেলে, নাম বসন্ত। চাটুজ্জ্যে তাকে আদর করে ডাকত বাসন্তী বলে। বাসন্তীর যেই বসন্ত হ'ল অমনি চাটুজ্জ্যের আদর ছুটে গেল। কত রাত কত রঙ্গ করেছে মেয়েটার সঙ্গে, সব ভুলে গেল। রোগের ভয়ে দে ছুট-দে ছুট।

শান্তি। আর তুমি রয়ে গেলে। রয়ে গিয়ে কি করলে?

শরৎ। কি আর করবো? জল দিলাম। মেয়েটি জল খেয়ে চোখ বুঝলো। গোটা শরীর বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গেছে। মুখখানা আর চেনবার উপায় নেই। মায়া লাগলো। চলে আসতে গিয়েও আসতে পারলাম না।

শান্তি। তারপর?

শরৎ। এদিকে নেশা লেগেছে। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম মদ আছে। মেয়েটি দেরাজ দেখিয়ে বালিশের তলা থেকে

চাবি বার করে দিল। রাত্তির চারটে পর্যন্ত এক বোতল শেষ করলাম। পাখী ডেকে উঠতে সম্বিত ফিরলো। তাকিয়ে দেখি বাসন্তী ঘুমুচ্ছে।

শান্তি। তারপর ?

শরৎ। বাড়ী এসে একটু শুলাম। এখুনি আবার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে। আহা! মেয়েটার বড় কষ্ট।

শান্তি। চাটুজ্জ্যে বাবুকে নিয়ে যেও। তার আদরের বাসন্তী।

শরৎ। সে আর গেছে। রোগের ভয়ে তার প্রেম পালিয়েছে।

শান্তি। পুরুষ জাতটাই অমনি নিমকহারাম।

শরৎ। অমন কথা বলিস না শান্তি, আমি কি পুরুষ নই ?

শান্তি। মোটেই না।

শরৎ। এই মরেছে। তবে কি মেয়েছেলে ?

শান্তি। মোটেই না।

শরৎ। তবে ?

শান্তি। দাদাঠাকুর। তুমি আমাদের দাদাঠাকুর।

[হাসতে হাসতে ছুট দিল শান্তি ঘরের দিকে। হেসে শরৎচন্দ্র সকলের দিকে ফিরলো। তারা হাঁ করে শরতের গল্প শুনছিল। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি শীতলচাঁদ। সে এগিয়ে এলো।]

শীতলচাঁদ। দাদাঠাকুর! একটা কথা বলবো ?

শরৎ। বলো।

শীতল। আমায় একটা দরখাস্ত লিখে দেবে ?

শরৎ। কিসের ?

শীতল। ছুটীর।

শরৎ। কেন ?

শীতল। আমার বড় মন কেমন করছে।

শরৎ। মন কেমন করছে তা ছুটী নিয়ে কি করবে ?

শীতল। মাওালোয় আমার ভাইয়ের বাড়ীতে কামিনীকে রেখে এসেছি। তাকে একটু দেখতে যাবো। চারিদিকে সব মায়ের দয়া হচ্ছে।

শরৎ। অমনি তোমার মনে ভয় ঢুকে গেল ? ঠিক আছে সন্ধ্যা-বেলায় দেবো অখন। তোমাদেরও এখন কাজ আছে। বেলা বাড়ছে। আমাকে একটু বেরোতে হবে।

[সকলে যে যার ঘরের দিকে যায়। শরৎচন্দ্র ওষুধের বাক্স হাতে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ একটু নিস্তব্ধ থাকে। এদিকে বেলা বেড়ে চলে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘোষালবাবু একটা ঘরের দরজায় থামলেন। ঘোষাল বৃদ্ধ বয়সেও সৌখিন।]

ঘোষাল। হরিহর, ও হরিহর। হরিহর বাড়ী আছনি। বলি ও হরিহর।

[অন্দর থেকে হরিহর চক্রবর্তীর সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সে বেরোবার আগেই গাছকোমর বেঁধে বেরিয়ে আসে শান্তি।]

শান্তি। কি ব্যাপার, ঘাটের মড়া। সকালবেলাই আবার কি

দরকার পড়লো? কাল তো অত রাত্রি পর্যন্ত জ্বালিয়ে গেলেন।

ঘোষাল। এই দ্যাখো, এই দ্যাখো, তুমি কেমন কথা কও, শান্তি? তোমার বাপের লগে একটু কাম্ আছিল।

শান্তি। আপনার তো কামের অন্ত নেই। খালি মদ গেলা, আর আমার বাবাকে কুমতলব দেওয়া।

ঘোষাল। হ্যাইডা তুমি কেমন কথা কইলা, শান্তি? তোমার বাপেরে আমি কুমতলব দেই? তুমি পোলাপান, পোলাপানের মত থাক। বুড়া মান্‌সের লগে কথা কইতে আইও না। তোমার বাপে আমারে ভক্তি করে, তাই আসি।

শান্তি। আমার বাবা, আপনাকে ভক্তি করে না।—ভক্তি করে আপনার টাকাকে।

ঘোষাল। ওই, হইল। ওই একই কথা। মান্‌সের ট্যাহা না থাকলে আর রইল কি? ট্যাহাই স্বর্গ, ট্যাহাই ধর্ম্ম, ট্যাহাই সব। কিন্তু শান্তি, রাগলে তোমারে বড় সুন্দর দেখায়। গাল দুখান আগুনের পারা রাঙা হইয়া উঠে।

শান্তি। মুখপোড়া। নাতনীর বয়সী মেয়ের শরীরের দিকে তাকাতে লজ্জাও করে না। ঘাটের মড়া।

ঘোষাল। হেঁ, হেঁ, হেঁ। কিযে কও, লজ্জা! লজ্জা নারীর ভূষণ। আমি পুরুষ। পুরুষের লজ্জা থাকলে চলে? আর বয়স? বয়সের কথা যদি কইলা, তা'ইলে কই অখোনো তোমাগো

মত দশটা মাইয়্যারে চাইপ্যা মাইরা ফেলতে পারি। দেখবা নাকি একবার, পরীক্ষা কইর‍্যা ?

শান্তি। মুড়ো ঝাঁটা তোর মুখে। ঘাটের মড়া।

[এমন সময় হরিহর পেছন থেকে এসে শান্তির চুলের মুঠি ধরে।]

হরিহর। হারামজাদী, মুখে যা আসে তাই বলবি? খেয়ে দেয়ে তোর বড় তেজ হয়েছে না হতচ্ছাড়ী, নষ্ট মেয়ে, ঘর জ্বালানে।

[ছুম্ ছুম্ করে মেয়ের পিঠে কিল মারতে থাকে হরিহর। চীৎকার করে কেঁদে ওঠে শান্তি।]

শান্তি। মরে যাবো, মরে যাবো আমি। মাকে খেয়েছো, এইবার আমাকে খেতে পারলে বাঁচো।

[ছুটে ঘরে পালিয়ে যায় সে।]

ঘোষাল। মারো ক্যান, মাইয়্যাডারে মারো ক্যান? পোলাপান আর কারে কয়? অগো কি আর কাণ্ডজ্ঞান আছে? আহো, চলো, তোমার লগে দুগা কথা আছে।

[হরিহরের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায় ঘোষালবাবু। মঞ্চ আবার একটু নিস্তব্ধ। কোথায় যেন একটা কুকুর ক্রমাগত ডেকে চলেছে। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়। কুকুরের ডাক ক্রমেই জোরে হয়। একটু পরে প্রবেশ করে গিরীন।]

গিরীন। শরৎ, শরৎ—একি শরৎ তো এখনো ফেরেনি।

[ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শান্তি।]

শান্তি। আপনি কাকে খুঁজছেন ?

গিরীন। শরৎকে।

শান্তি। উনি রোগী দেখতে গেছেন

গিরীন। কোথায় ?

শান্তি পোজনডং লেনে, বাসন্তী না কে যেন একজন মেয়েছেলে থাকে। তার মায়ের দয়া হয়েছে, সেইখানে।

[এমন সময় শরৎচন্দ্র প্রবেশ করে। বিধ্বস্ত ও ক্লান্ত।]

গিরীন একি হে শরৎ ? চেহারাটাকে এমন করে ফেললে কেন ?

শরৎ। মড়া পুড়িয়ে এলাম।

গিরীন। সেকি ?

শরৎ। হাঁ, "পকসের" মড়া। শান্তি, একঘটি জল এনে, তাতে একটা তুলসী পাতা দিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দে।

শান্তি। আমি পারবো না যাও। তোমার যত অনাছিষ্টি কাণ্ড। মড়া পুড়িয়ে কেউ চান না করে ঘরে ঢোকে ? তোমার কি জাত জন্ম কিছু নেই ? ঘেন্নাপিত্তি নেই। রোগের ভয় নেই ?

শরৎ। না নেই। যা বলছি, তাই কর। বেশী কথা বললে এক থাপ্পড় খাবি।

[শান্তি একটু তাকিয়ে থেকে দুম্ দুম্ করে চলে যায়।]

গিরীন। কি ব্যাপার বলত শরৎ।

শরৎ। ব্যাপার আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষের আর একটা হত-ভাগিনী, টুপ করে ঝরে পড়লো। মা, বাবা, ছেলেমেয়ে,

স্বামী, কেউ তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেললো না। রেঙ্গুন শহরের জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনিই চলছে। ক্ষতি হলো না কারো কিছুই শুধু কতগুলো ফুর্তিবাজ লোকের ফুর্তির একটা জায়গা নষ্ট হলো।

[শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে আসে।]

জানো গিরীন, হতভাগিনী মরবার সময় একটা কথাও বলে যেতে পারে নি। ওর কদাকার মুখের উপর বড় বড় দুটো চোখ, শুধু জলে ভেসে যাচ্ছিল।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শরৎচন্দ্র। তার চোখে জল। শান্তি ঘটিতে করে জল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।]

শান্তি। দাদাঠাকুর!

শরৎ। উঁ?

শান্তি। জল।

শরৎ। ওঃ! দে, ছিটিয়ে দে আমার গায়ে।

[নিজেকে সংযত করে নেয় শরৎচন্দ্র। শান্তি শরতের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর ঘটি নিয়ে ঘরে চলে যায়।]

শরৎ। গিরীন, বলো তুমি কি জন্য এসেছো?

[এমন সময় শীতল ছুটতে ছুটতে আসে।]

শীতল। দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, শিগগীর এসো, এখুনি সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

শরৎ। কি হয়েছে?

শীতল। ডি'কস্টা সাহেব তার বৌয়ের গলা টিপে ধরেছে।

শরৎ। সেকি ? কেন ? সেখানে আর কেউ নেই ?

শীতল। আছে সকলেই, কিন্তু কেউ সাহেবকে থামাতে পারছে না

শরৎ। উঃ। এ মানুষটাকে নিয়ে তো আর পারা যায় না। একটা টি. বি. রুগী। বুকের পাঁজরাগুলো দুদিন পরে ঘায়ে খসে খসে পড়বে, সে খেয়াল নেই। দিবারাত্র মদ খাচ্ছে, আর বৌ ঠেঙ্গাচ্ছে।

[শরৎ বেরোতে যাবে ইতিমধ্যে ডি'কস্টা ঢোকে। মদে সে চুর।]

শরৎ। এই যে মিঃ ডি'কস্টা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

ডি'কস্টা। **Why not ?**

শরৎ। এক বছর আগে তুমি আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার নিয়েছিলে তোমার বৌকে দেশ থেকে আনবার জন্য।

ডি'কস্টা। **Yes Chatterjee, for that I am grateful to you.**

শরৎ। বৌকে ছেড়ে থাকতে পারছিলে না বলেই তো নগদ পাঁচশো টাকা খরচ করে "গোয়ায়" গিয়ে বৌকে এনেছিলে ?

ডি'কস্টা। **Hundred percent correct.** ।

শরৎ। তা'হলে আজ গলা টিপে তাকে মারতে যাচ্ছিলে কেন ? **Is that wine, that made you so mad ?**

ডি'কস্টা। For God's sake. Don't Chatterjee don't blame wine, wine is my friend, wine হামাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। টুমি জানে কেন হামার "বিলাভেড" ওয়াইফকে হামি গলা দাবিয়ে মেরে ফেলতে চায়?

শরৎ। নিশ্চয়ই সে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি?

ডি'কস্টা। Yes, করেছে, My beloved wife has betrayed me.

[স্তব্ধতা]

তুমি তো হামার দোস্ত গোমেজকে জানে?

শরৎ। জানি।

ডি'কস্টা। গোমেজকে হামার ঘরে হামি রেখেছি। হামার বৌ ওকে রান্না করিয়ে খেতে ডেয়। But Gomes is ungrateful.

শরৎ। কিন্তু তোমার বৌ তোমাকে ভালবাসে। তোমাকে ভাল করে চিকিৎসা করবার জন্য তোমার বৌ আমার হাতে পায়ে পর্যন্ত ধরেছে।

ডি'কস্টা। But if I die to-morrow you will know that she is the cause for my death।

শরৎ। ডি'কস্টা।

ডি'কস্টা। তুমি জানে, তুমি জানে চ্যাটার্জী, হামার বৌ, my

beloved wife, আজ গোমেজকা সাথ শুয়াথা, হামার এ দুটো আঁখ দিয়ে হামি দেখেছি। My darling is sleeping with Gomes. গোমেজের ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে হামার ওয়াইফ গোমেজকা সাথ খারাপ কাম করলো চ্যাটার্জ্জী।

[কান্নায় ভেঙে পড়লো ডি'কস্টা]

শরৎ। ডি'কস্টা !

ডি'কস্টা। তোমার টাকা হামি শোধ করিয়ে দেবে চ্যাটার্জ্জী। হামার ডো হাজার রুপায়াকা ইন্‌সিওর আছে। ও হামি তোমার নামে "মর্টগেজ" করিয়ে ডিবে। লেকিন তোমার টাকাটা কাজে লাগলো না চ্যাটার্জ্জী। ওটো খরচ করিয়ে হামি বৌকে আনলাম, but bloody Gomes is enjoying her.

[ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে ফিরে দাঁড়ায়।]

শরৎ। ডি'কস্টা। মাথা ঠাণ্ডা করো। উত্তেজিত হলে তোমার কাশি আসবে। কাশতে গেলে আবার গলা দিয়ে:রক্ত বেরোবে।

ডি'কস্টা। Don't stop me Chatterjee। হামি ওই তো দেখতে চায়। হামার রক্ত যডি নিকলে, তো ওই রক্ত হামার ওয়াইফকে প্রেজেণ্ট করবে। I loved her

against crown, you know Chatterjee! alright টুমি ডেখতে চায়? টুমি ডেখতে চায়? আঁ? alright তুমি ডেকিয়ে নিও। রক্ত ডেখে ভি হামার ওয়াইফ হামাকে ভালোবাসবে না। She will still love Gomes! But I love her—only her!

[ডি'কস্টা শরতের কাঁধে মুখ রেখে শিশুর মত কাঁদতে থাকে। বিচলিত স্তব্ধ মানুষগুলোকে নিয়ে মঞ্চ ঘোরে।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছে। হরিহরের ঘর থেকে একফালি আলো ওর দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। দূরাগত শেয়াল কুকুরের ডাক ও হরিহরের ঘর থেকে মত্ত কয়েকটা মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। প্রতি সন্ধ্যার মত হরিহরের ঘরে তাদের আড্ডা বসেছে। হঠাৎ হরিহরের ঘর থেকে একটা ঝগড়ার শব্দ শোনা যায় এবং তারপরই একটা মানুষ হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটা দেয়। তার পিছনে বেরিয়ে আসে হরিহর।]

হরিহর। এই শোন্। এই শীতলচাঁদ, আরে শোন না, হতভাগা।

শীতল। শোনাশুনির আর কিছু নেই হরিহরদা, তোমার এই আড্ডায় আমি আর আসছি না। সকলে মিলে রোজ আমার পিছনে লাগবে।

হরিহর। আরে বাবা, বন্ধু-বান্ধব একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করবে না।

শীতল। পরের কেচ্ছা না করলে কি ইয়ার্কি হয় না? কেচ্ছা কার না ঘরে আছে? ওই ডি'কস্টার ঘরে কেচ্ছা নেই। ডি'কস্টার বৌ ওর বন্ধু গোমেসের সঙ্গে থাকে না?

[হঠাৎ কিঞ্চিৎ উন্মত্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে ঘোষাল]

ঘোষাল। হ থাকে, একশবার থাকে। কিন্তু ডি'কস্টা তোমার মত মিথ্যা কথা কয় না। আরে বাবা, পরের পরিবাররে ভাগাইয়া লইয়া আইছ। ব্যাশ করছ।

শীতল। ঘোষালদা, মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিচ্ছি।

ঘোষাল। আরে রাখ'। ক্যান্ তোমারে ডরাই নাকি? তুমিই কও চক্রবর্তী। শীতলচাঁদের এতে লজ্জার কি আছে। এই রেঙ্গুন শহরের হাজারডা বাঙ্গালীর নাড়ীর খবরত আমি রাখি। দুই-তিনডা বৌ লইয়া ঘর করে না, এমন বাঙ্গালী তো রেঙ্গুনে কমই দেখি। তা শীতলচাঁদের দোষটা কি? বন্ধুর বৌ-এর লগে পীরিত হইছে। সেই বৌয়ে নিজের বৌ করার লাইগ্যা, একদিন কাঁচড়াপাড়া ইস্টিশন থিকা র‍্যালে চাইপ্যা, এক্কেবারে রেঙ্গুন আইয়া হাজির। আরে এত পুরুষ মাইনষের কামরে মশয়। বুকের পাটা আছে তোমার শীতলচাঁদ। ডি'কস্টা শালার মত কান্নাকাটি তো তুমি কর নাই।

[শীতলের হাত ধরে]

আস। আরে আস। দুই পাত্র প্যাটে পড়লেই তোমার রাগ চইল্যা যাইবো অনে। আস আস।

[শীতল ইতস্তত করে। হরিহর ওর হাত ধরে। তিন-জনেই হেসে ওঠে। ঘরের দিকে এগোয়। দরজার কাছে গিয়ে শীতলকে দরজার দিকে ঠেলে দেয় ঘোষাল।]

যাও ঘরে যাও, আমরা আসত্যাছি।

[শীতল একটু তাকিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। ঘোষাল হরিহরের হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে আসে।]

ঘোষাল। শোন চক্রবর্তী। তোমার সংগে দুগা কথা আছিল।

হরিহর। বলুন।

ঘোষাল। কমু আবার কি। জানতো সবই।

হরিহর। কি ব্যাপার ?

ঘোষাল। ব্যাপার আবার কি ? একেরে গাছ থিকা পড়লা মনে হইত্যাছে ? যৈবনডা একেরে চইল্যা গ্যালে তোমার মাইয়ার সাথে আমার বিয়া দিবা নাকি ?

হরিহর। অত তেজ দেখাবেন না ঘোষালবাবু। নিজের বয়সের কথাটাও চিন্তা করবেন।

ঘোষাল। আবার তুমি বয়সের কথা কও হরিহর। আমার বাপে বার খান কুলীনের মাইয়া উদ্ধার করছিল। আমার তো অখনো তিন খান বিয়াই হইল না। আমার বাপে যখন শ্যাষ বিয়া করে তখন তার বয়স আছিল সৈত্তর। আমার তো অখনো যাইটই হইল না।

[এমন সময় ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এবং বহু কণ্ঠের হাসি শোনা যায়। চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে শান্তি। তার শাড়ীর অবস্থা বেসামাল।]

শান্তি। বাবা, আর আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না। তোমার মত বাপের সঙ্গে থাকার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরা ভাল। তুমি না ব্রাহ্মণ, তুমি না পূজা আর্চ্চা কর ?

হরিহর। আঃ কি হয়েছে বলবি তো ?

শান্তি। ওই ঘাটের মড়া যুধিষ্ঠির বল্লে—মদ ফুরিয়ে গেছে। শান্তি মদ দে। গেলাসে মদ ঢেলে যেই ওকে দিতে গেছি,

অমনি আমার কাপড় ধরে টান দিলে। আমিও এক থাপ্পড়ে ওর গাল লাল করে দিয়েছি। শূয়োরটা অমনি আমার হাত ধরে কামড়ে দিলে।

হরিহর। তাতে হয়েছেটা কি? তুইও মেরেছিস, সেও তোকে কামড়েছে। মাতাল হলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে? যা ভিতরে যা, ওরা যা চায় দিগে যা।

শান্তি। আমি পারবো না। আমাকে কি পেয়েছ তুমি? একটা বাজারের মেয়েছেলে? আমি তোমার মেয়ে না? অতগুলো ব্যাটাছেলে মাতালের মধ্যে আমাকে ফাইফরমাস খাটতে বলো—তোমার লজ্জা করে না। মেয়ের ইজ্জত বিক্রী করে তুমি পয়সা রোজগার করতে চাও।

[হরিহর রাগে ঠাস করে শান্তির গালে চড় কষিয়ে দেয়।]

হরিহর। চুপ কর হারামজাদী। এতই যদি তেজ তবে আমার মত মিস্ত্রির ঘরে জন্মেছিলি কি জন্য? আর তোর মা মাগী বড় সেয়ানা। একটা ধাড়ী বজ্জাত মেয়ে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে—মনের সুখে পটল তুলে ফেললো।

[শান্তি স্তব্ধ, বিমূঢ়, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। হরিহর ঘরের দিকে ছোটে।]

দাঁড়া ওই ব্যাটা যুধিষ্ঠিরকে আমি দেখাচ্ছি। ব্যাটার আস্পর্ধা দিনদিন বেড়েই চলেছে।

[হরিহর ঘরে ঢোকে। ঘোষাল এগিয়ে আসে শান্তির দিকে।]

ঘোষাল। শান্তি! আহা! তোমার বড় কষ্ট। খাড়াও আইজই আমি এর একটা ব্যবস্থা করুম। আস, আমার কাছে আস।

[শান্তিকে টানে। শান্তি ঘোষালের মুখে থু থু ছিটিয়ে দেয়।]

শান্তি। থুঃ থুঃ থুঃ। মর ঘাটের মড়ারা—সব। মর, মর, মর।

[উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘরের দিকে ছোটে শান্তি। এমন সময় ধাক্কা মারতে মারতে যুধিষ্ঠিরকে ঘরের বার করে দেয় হরিহর।]

হরিহর। বেরো শালা উজবুক। বেরো আমার ঘর থেকে।

যুধিষ্ঠির। আরে ধক্কা মারিছন্তি কাঁহিকি? মু কড় কলি?

[যুধিষ্ঠিরের পা টলছে। গলার স্বরে রীতিমত জড়তা।]

হরিহর। মু কড় কলি? শালা আমার ঘরে বসে বেহায়াপনা করছিস।

যুধিষ্ঠির। কাঁহিকি করিবি নাহি। মদ খাইবাকু পোয়সা দেহি নাহি কি? তু শড়া পোয়সা নবু, পুনি ধক্কা মারিবু? শড়া নিজের ঝিও কু বেশ্যা করিছু। তাপরে পুনি বড় বড় কথা—

হরিহর। তবে রে শালা।

[হরিহর ছুটে এসে যুধিষ্ঠিরকে ধাক্কা মারে। যুধিষ্ঠির মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। হরিহর ঘরে চলে যায়। স্তব্ধতা। ঘোষাল এগিয়ে আসে। কি যেন ভাবে তারপর যুধিষ্ঠিরকে টেনে তোলে। যুধিষ্ঠির মার খেয়ে হাঁপাচ্ছিল, সে ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

ঘোষাল। যুধিষ্ঠির। হরিহর চক্কবর্তীরে জব্দ করবি ?

যুধিষ্ঠির। কড় কহিলে ?

ঘোষাল। কইতাছি, হরিহর চক্কবর্তীরে জব্দ করবি? অর বড় বাইড় বাড়ছে।

যুধিষ্ঠির। করিবি। শড়াকু জবদ করিবি।

ঘোষাল। তাইলে এক কম কর। পারবা ?

যুধি। ·কি কাম ?

ঘোষাল। বড় রাস্তা থিয়া একখান ঘোড়ার গাড়ী ডাইক্যা লইয়া আয়। বুঝছিস ? এইখানে আনিস না যান।

যুধি। তবে কৌঠিকি আনিবি ?

ঘোষাল। এই বাড়ীর পিছনে গাড়ীখান লইয়া তুই খাড়াইয়া থাক্। বোঝছোসনি ?

যুধি। হাঁ, বুঝিছি। তা পরে? আপনি কঁড় করিবে ?

ঘোষাল। ওই চক্কবর্তীর মাইয়া শান্তি, অরে জোর কইর‍্যা লইয়া যামু গিয়া। বোঝছনি ?

যুধিষ্ঠির। হাঁ বুঝিছি।

[খিল খিল করে হেসে ওঠে যুধিষ্ঠির]

ঘোষাল। তাইলে যা। দেরী করিস না। যা ব্যাটা।

[যুধিষ্ঠিরকে ঠেলা দেয় ঘোষাল। যুধিষ্ঠির ছুটে বেরিয়ে যায়। ঘোষাল কিছুক্ষণ ভাবে, ভিতরে সমানে হুল্লোড় চলছে। ঘোষাল হরিহরকে ডাকে।]

চক্রবর্তী, বলি ও চক্রবর্তী।

[হরিহর বেরিয়ে আসে]

শান্তিরে আইজই আমি বিয়া করুম। তুমি আর আপত্য কইরো না। মাইয়ার তোমার বদনাম হইছে। ওই মাইয়ারে বামুন তো দুরের কথা, কোন কায়স্থও লইবো না। পাঁচ পুরুষের হাতে মদের পাত্তর তুইল্যা দ্যায় যে মাইয়া, তার কি জাতের ঠিক থাকে? কও কথাডা আমি ঠিক কই কিনা

হরিহর। আপনি ঠিকই বলেছেন ঘোষালবাবু। আমার ঐ মেয়েকে কেউ ঘরে নেবে না। কিন্তু ওই মেয়েটার জন্যই তো দুটো পয়সা রোজগার হয়।

[হরিহর প্রায় কেঁদে ফেলে]

ঘোষাল। যাও তোমার মাইয়ারে লইয়া আহ।

[হরিহর ভিতরের দিকে ছোটে, ঘোষাল হাসতে থাকে শয়তানের মত। ভিতর থেকে শান্তির চিৎকার এবং হরিহরের গালাগালির শব্দ শোনা যায়, অবশেষে চুলের মুঠি ধরে শান্তিকে টানতে টানতে নিয়ে আসে হরিহর। শান্তি বাপের বুকে কিল চড় ঘুষি মারছে। ভিতরের মাতালগুলো সব দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হতভম্ভ হ'য়ে।]

হরিহর। মেরে ফেলবো শান্তি। একেবারে মেরে ফেলবো। একদিন

তো বরের ঘরে যেতেই হবে। চিরকাল আইবুড়ো অ
ধিঙ্গি থাকবি, আর আমার মুখ পোড়াবি।

ঘোষাল। খাড়াও, খাড়াও, চক্রবর্তী। আমিও ধরি। তুমি একা
পারবা না।

[ঘোষাল কাছে যেতেই শান্তি একেবারে চুপ করে যা
তারপর ধপাস করে পড়ে যায়]

ঘোষাল। অজ্ঞান হইয়া গ্যাছে গিয়া, অজ্ঞান হইয়া—হরিহর জ
লইয়া আস।

[হরিহব ও মাতালরা সব ভিতরের দিকে ছোটে
ঘোষাল নিচু হয়ে শান্তির কাছে বসতে যায়। শান্তি এ
ধাক্কা মেরে ঘোষালকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। বাহি
একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডেকে ওঠে। ঘোষাল চিৎক
করে ওঠে।]

ঘোষাল। গেছিরে। বাপ মরছিরে।

[এক বালতি জল হাতে হরিহর এবং তার পিছ
মাতালরা ছুটে বেরিয়ে আসে। হরিহর তাড়াতাড়ি
নিয়ে ঘোষালের মাথায় ছেটাতে সুরু করে। ঘোষাল কা
ওঠে।]

ঘোষাল। তোমার মাইয়া পলাইছে। হরিহর তারে খোঁজ। এ
মাইয়া কেউটের বাচ্ছা অনেক ছেনালী শিখছে।
ওরে।

[সকলে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে। এমন সময় যুধিষ্ঠির ঢোকে।]

।ষ্ঠির। গাড়ী আসি গলা।

লে। চোপ শালা।

[যুধিষ্ঠির ভয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।]

রহর। ঠিক আছে। হারামজাদী ফিরুক আজ বাড়ীতে।

[হরিহর ঘরে যায়। ঘোষাল খোঁড়াচ্ছে। তাকে ধরে সকলে টলতে টলতে প্রস্থান করে। মঞ্চে সাময়িক স্তব্ধতা বিরাজ করে। শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ। আর কুকুর শেয়ালের চিৎকার। মঞ্চের আলো কমতে থাকে। এক সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে শাস্তি সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যায়। আবার স্তব্ধতা। প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র ক্লান্ত চরণে উপরে উঠতে থাকে। দরজার কাছে গিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শরৎ দরজা ঠেলে কিন্তু খোলে না।]

ৎ। ঘরে কে? কে ঘরের ভেতরে?

[দরজা হঠাৎ খুলে যায় এবং শান্তি শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শরৎ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে।]

ৎ। কে? কে তুমি?

স্তি। আমায় বাঁচাও দাদাঠাকুর। আমায় বাঁচাও। আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো দাদাঠাকুর। আমায় বাঁচাও।

[শান্তি শরতের পায়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে থাকে। শ
ব্যস্ত হয়ে ওকে হাত ধরে তোলে।]

শরৎ। এ কীরে? তুই এরকম করছিস কেন? তোর কি হয়েছে

[শান্তি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।]

শান্তি। বাবা আমাকে ঘোষাল বুড়োর কাছে বিক্রী করে দিয়েছে ঘোষাল বুড়ো মদ খেয়ে আমাকে আজ জোর করে ধ নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কোন রকমে পালিয়ে তোম ঘরে খিল দিয়েছি। আর আমি কোথাও যাব দাদাঠাকুর। তুমি আমাকে বাঁচাও। সকাল হলে বা আবার আমাকে জোর করে ঘোষালের কাছে পাঠি দেবে।

শরৎ। চুপ কর। পাঠালেই হোল। কতগুলো লোভী, নী মাতাল জুটে যা ইচ্ছে তাই করবে?

[একটু চুপ করে থেকে]

ঠিক আছে। তুই আয় আমার সঙ্গে। আজ তোর বাবা ব্যবস্থা আমি করছি।

[শান্তির হাত ধরে রাগে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নে আসে শরৎ। হরিহরের দরজায় ঘা মারে।]

শরৎ। ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই। দরজা খুলুন।

[একটু পরে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে হরিহর, চো ঘুম জড়ানো]

হরিহর। কি ব্যাপার? দাদাঠাকুর! এত রাতে—

[শান্তিকে দেখে]

এই যে হারামজাদী, তুই কোথায় ছিলি, একে বুঝি ধরে নিয়ে এলে রাস্তা থেকে ? মুখপুড়ি বুঝি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল ?

শরৎ। হ্যাঁ। ঘুরছিল। আপনি ঘরে খিল এঁটে ঘুম লাগাচ্ছেন ? আর মেয়েটা বাইরে রয়েছে কেন ?

হরিহর। ও ছেনালের কথা আর বোল না—

শরৎ। চুপ করুন। নিজের মেয়েকে গালাগালি দিতে লজ্জা করে না ? ঘোষাল একে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কি জন্য ?

হরিহর। ধরে নিয়ে যায়নি। ঘোষালবাবুর সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দোব।

শরৎ। একটা কচি মেয়েকে পয়সার লোভে, একটা গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন ?

হরিহর। গঙ্গাযাত্রী কেন বলছো দাদাঠাকুর। একটু বয়স হয়েছে। তা পুরুষ মানুষের আবার বয়স কি ? তাছাড়া ঘোষালবাবু আমার অনেক উপকার করেছে।

শরৎ। উপকার মানে তো কিছু টাকা দিয়েছে ?

হরিহর। তাইবা কে দেয় ? ওর সঙ্গেই আমি মেয়ের বিয়ে দেব কথা দিয়েছি।

শরৎ। টাকা শোধ করে দিন।

হরিহর। পাবো কোথায় ?

শরৎ। আমি দেবো।

[স্তব্ধতা]

হরিহর। কেন ?

শরৎ। মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য।

হরিহর। টাকা দিলেই মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবে। সমাজে আমার মেয়ের কলঙ্ক রটেছে।

[কেঁদে ফেলে]

আমি যে গরীব। আমার মেয়ের যে কলঙ্ক। আমাদের তোমরা দয়া করতে পারো—বড়জোর রাঁধুনি রেখে বামুনের মেয়েকে দুটো পয়সা দিতে পারো—

শরৎ। বিয়ে করতেও পারি।

হরিহর। আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে ?

শরৎ। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! আপনার মেয়েকে, আপনার শান্তিকে—

[হরিহর ও শান্তি একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে]

হরি/শান্তি। দাদাঠাকুর !

[স্তব্ধতা]

শরৎ। আপনি আমায় ক্ষমা করুন ঠাকুরমশাই। আপনি আমার চোখ ফুটিয়েছেন। আপনি ব্যবস্থা করুন, আপনার শান্তিকে আমি বিয়ে করবো।

শান্তি। না এ হয় না। বাবা, এ সব তুমি কি বলছো ? দাদাঠাকুর দেবতা। তাকে তুমি—

[শরৎ চমকে ওঠে]

শরৎ। শান্তি, চুপ কর। এক চড়ে তোর,—বড়দের মুখের ওপর কথা ?

[শান্তি ভয়ে থেমে যায়। শরৎ ওর হাত ধরে বলে]

শরৎ। কিরে পাগলি! পারবি না তোর দাদাঠাকুরকে চিরকালের মত আপনার করে নিতে?

[হরিহর আনন্দে কেঁদে ফেলে]

হরিহর। ভগবান! কত সুখ তুমি তুলে রেখেছিলে। এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণের দুখিনী মেয়ের জন্য। শান্তি উদ্ধার হয়ে গেলি মা, উদ্ধার হয়ে গেলি—।

[বেতসপাতার মত থরথর করে কাঁপছিল শান্তি। উচ্ছসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে শরতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে। স্তব্ধ হতবাক তিনটি প্রাণীকে বুকে করে মঞ্চ অন্ধকার হয়। কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে সানাই। বিশ্বপ্রকৃতি বিলীন হয়ে যায় সেই সুরের গভীরে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[অন্ধকারে ঘোষিত হয়:

"আনন্দোচ্ছল স্রোতের মত শরৎ-শান্তির বিবাহিত জীবনের দুটো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।"

শরতের ঘর। সময় সন্ধ্যা। হরিহর মঞ্চ অতিক্রম করে বাইরের দিকে যাচ্ছিল, প্রবেশ করে শীতলচাঁদ। শীতলের চেহারা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। সে কাশছে। ঘরের একপাশে ইজেলে, একটি অর্ধসমাপ্ত নারীর ছবি। পাশে রং তুলি একটা টুলে রাখা।]

শীতল। দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর।

হরিহর। কে শেতল? এসো।

শীতল। দাদাঠাকুর বাড়ী নেই?

হরিহর। আছে, কেন বলত?

শীতল। আমার জ্বর হয়েছে, সমস্ত গায়ে ব্যথা। একটু ওষুধ নেব।

হরিহর। তোমরা কি মানুষটাকে বাঁচতে দেবেনা বাপু!

শীতল। কেন ঠাকুরমশাই?

হরিহর। কেন? সারাদিন তো মানুষটা টই টই করে ঘুরছে। কার অসুখ, কার মড়া পোড়ানো, কার বিয়ে দেওয়া, কার চাকরী করে দেওয়া—ঘরে তার একটা বৌ রয়েছে, বাচ্চা রয়েছে, বাচ্চাটার আজ দুদিন ধরে জ্বর—

শীতল। এত কথা তুমি আমাকে কেন বলছো ঠাকুরমশাই?

দাদাঠাকুর চিরকাল আমাদের অসুখ বিসুখে দেখে এসেছে তাই—

হরিহর। বিনা পয়সায় ওষুধ পেয়েছো। ডাল ভাতের মতো খেয়ে যাচ্ছো। অসুখ না ছাই করেছে। গা একটু গরম হয়েছে —অমনি—

শীতল ছ্যাখো ঠাকুরমশাই, অমন করে কথা বোলনা। আজ না হয় দাদাঠাকুর তোমার জামাই হয়েছে—তাই তার জন্য তোমার দরদ উথলে উঠছে। কিন্তু শরৎ চাটুজ্জ্যের কাছ থেকে হাত পেতে উপকার নেয়নি—এমন মানুষ এই গোটা কুলি ব্যারাকে একটাও খুঁজে বার করতে পারবে? খালি আমারই দোষ! তুমি কি কম উপকার নিয়েছ দাদাঠাকুরের কাছ থেকে?

হরিহর। ছ্যাখ শেতল, আমাকে ঘাঁটাস না। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

শীতল। কেন তোমাকে ভয় করি নাকি? ওঃ! ভারি আমার মুরুব্বিরে। শরৎ চাটুজ্জ্যের শ্বশুর হয়েছ বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছো নাকি! ভালো মানুষ পেয়ে দাদাঠাকুরকে তুমি ঠকাওনি?

হরিহর। ঠকিয়েছি?

শীতল। নিশ্চয়ই ঠকিয়েছো। নিজের দজ্জাল নষ্ট মেয়েটাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দাওনি। আমরা দাদাঠাকুরকে ভালবাসি তাই কথা বলিনি।—

হরিহর। ওরে হতচ্ছাড়া—আমার শান্তিকে বিয়ে করে শরৎ ঠকেনি। বাউণ্ডুলে মানুষটা ঘর পেয়েছে। ওদের দুজনের মিল যদি একবার দেখিস শেতল। আমার শান্তি মা শরতের ঘরখানাকে একেবারে স্বর্গ বানিয়ে তুলেছে। নিবি, নিবি, ওষুধ নিবি। এখন আমার মেয়ে জামাই একটু হাসি গপ্পো করছে। ছেলেটার জ্বর। কাল সারারাত ওরা জেগেছে। চল্ এখন চল্। পরে আসিস্, এ্যাঁ।

শীতল। এই তো বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বললে ঠাকুর। এতক্ষণ তেজ দেখাচ্ছিলে কেন? চলো। 'তাহলে না হয় পরেই আসবো—

[বেরিয়ে যায় হরিহর ও শীতলচাঁদ। প্রবেশ করে শরৎ ও শান্তি। উচ্চহাসিতে দুজনেই মুখর।]

শান্তি। দেখ, ভাল হবে না কিন্তু। তুমি দিনদিন ভীষণ অসভ্য হয়ে যাচ্ছো। অসভ্য, অসভ্য, অসভ্য।

শরৎ। সভ্য হতে চাই না শান্তি। অসভ্য হয়েই থাকতে চাই। তোমার আঁচলের তলায় প্রচণ্ড অসভ্যতায় দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাই।

শান্তি। তা আমি জানি। নিজের কাজকম্ম গান-বাজনা ছবি আঁকা সব গোল্লায় গেছে, শুধু বৌয়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

[হেসে ওঠে শরৎ]

শরৎ। কাজকম্ম আমার দ্বারা হবে না শান্তি। জানো, আগে ভালো গল্প লিখতাম। তাও ছেড়ে দিয়েছি।

শান্তি। গল্প লিখতে? কি গল্প?

শরৎ। সে অনেক গল্প! বড়দিদি, কাশীনাথ—

শান্তি। মানে নিজে বানিয়ে লিখতে?

শরৎ। হ্যাঁগো।

শান্তি। ধ্যুৎ! সে কি করে হবে? সে তো সব অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরা লেখে।

শরৎ। তাও তো বটে। আমি তো আবার লেখাপড়া জানি না।

শান্তি। না, জানো,—তবে অত বেশী জানো না। এই শোন, আমার এক কাকা, সেই যেগো চাঁটগায়ে আমাদের বাড়িতে থাকতো। সে খুব লেখাপড়া জানতো। একবার মনসা-মঙ্গলের পাঁচালী থেকে গল্প লিখে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

[হো হো করে হেসে ওঠে শরৎ।]

শরৎ। না বাবা, আমার দ্বারা অত ভালো গল্প লেখা হবে না। আমি কি অত লেখাপড়া জানি?

শান্তি। তার চেয়ে তুমি ছবি আঁকো আর গান করো। তোমার মত ছবি আঁকতে আর গান করতে আমি কাউকে দেখিনি।

শরৎ। আর মদ খেতে?

শান্তি। যা বলেছো, সে গুণে তোমার ঘাট নেই। কি করে যে অত নেশা ভাং করো, আমার একটুও ভাল লাগে না।

শরৎ। আমারও ভাল লাগে না শান্তি। কিন্তু না খেয়েও থাকতে পারি না। মাঝে মাঝে কত অসুখ করে। ডাক্তারেরা কত বারণ করে, তবুও ছাড়তে পারি না। অনেক ছোটবেলার অভ্যেস তো।

[শান্তির নজর পড়ে ইজেলের ছবির দিকে।]

শান্তি। হ্যাঁ গো, এই ছবিটা তুমি কাকে দেখে আঁকছো গো?

[শরৎচন্দ্র একটু স্তব্ধ হয়।]

শরৎ। ধর, তোমাকে দেখে।

শান্তি। ধ্যাৎ। আমি কি অত সুন্দর নাকি? আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি কার ছবি আঁকছো।

শরৎ। কার বলত?

শান্তি। বলব? তুমি রাগ করবে না?

শরৎ। রাগ করব কেন? বলো না।

শান্তি। সেই মেয়েটাকে দেখে।

শরৎ। কোন্ মেয়েটাকে দেখে?

শান্তি। সেই যে, একটা মেয়ে, ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিল, তুমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে কিন্তু সে রাজী হয়নি।

[বিস্মিত শরৎ চীৎকার করে]

শরৎ। শান্তি!

শান্তি। আমি জানি গো। আমি সব জানি। ছোটবেলার সেই মেয়েটাই তোমার মনপ্রাণ জুড়ে আছে। আমাকে তো

তুমি বিয়ে করেছ দয়া করে। একটা গরীব বামুনের মেয়েকে উদ্ধার করেছ।

[শান্তির কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়।]

শরৎ। ছিঃ শান্তি। আমাকে তুমি এত ছোট মনে করো না। অতীতের কথা জানিনা। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে তুমি ছাড়া জগতে আর কাউকে আমি চিনি না।

[ইতিমধ্যে বাইরে থেকে চীৎকার ভেসে আসে, 'শরৎ' 'শরৎ'।]

শান্তি। বোধ হয় গিরীন ঠাকুরপো এল॥ আমি ভিতরে যাই।

[প্রবেশ করে গিরীন। তার হাতে একটা পত্রিকা। শান্তি চলে যায়।]

শরৎ। কি ব্যাপার গিরীন! এত রাত্রে?

গিরীন। একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি।

শরৎ। কি বলত?

গিরীন। আমাদের এক বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি এই পত্রিকাটা সঙ্গে করে এনেছেন। পত্রিকার সম্পাদক হচ্ছেন সৌরীন মুখোপাধ্যায়। এতে একটা গল্প বেরিয়েছে—নাম 'বড়দিদি'।

[শরৎ চমকে ওঠে।]

গিরীন। কি ব্যাপার! তুমি চমকে উঠলে যে?

শরৎ। না। কিছু না। ব'লো।

গিরীন। আমার বন্ধু বলছে, এই গল্পটা নাকি বাংলাদেশে খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে।

শরৎ। কি রকম ?

গিরীন। কিরকম টিরকম জানি না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত নাকি এই গল্পটা পড়ে চমকে উঠেছেন। কিন্তু এই গল্পের লেখককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শরৎ। সে কি ? তারপর ?

গিরীন। লেখকের এক আত্মীয় নাকি বলেছেন যে, লেখক রেঙ্গুনে থাকে।

শরৎ। নাম কি তোমাদের ওই লেখকের ?

গিরীন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শরৎ চীৎকার করে ওঠে।]

শরৎ। শান্তি, শান্তি, আমার চাদরটা দাওতো। আমি একটু চাটুজ্জ্যের বাড়ী যাবো।

গিরীন। কি ব্যাপার! আমি এলাম, আর তুমি এখন চাটুজ্জ্যের বাড়ী যাবে ?

শরৎ। আজ একটু মদ খাবো।

গিরীন। শরৎ দোহাই তোমার, সব খুলে বল।

শরৎ। আরে ? কি বলবটা কি ?

গিরীন। কে এই শরৎচন্দ্র ?

শরৎ। তা আমি কি করে জানবো ? এত আচ্ছা জ্বালা হল ?

গিরীন। রেঙ্গুনে আর কোন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেই শরৎ!

[এদের উত্তেজিত চীৎকারে শান্তি বেরিয়ে আসে।]

শান্তি। কি ব্যাপার? তোমরা সব চেল্লাচ্ছ কেন?

গিরীন। ভীষণ ব্যাপার হয়ে গেছে বৌঠান।

শান্তি। সে কি! কি ব্যাপার?

গিরীন। কে এক শরৎচন্দ্র রাতারাতি বিরাট বিখ্যাত লোক হয়ে গেছে গল্প লিখে। সেও রেঙ্গুনে থাকে। আমরা ভেবেছি আমাদের শরৎ। কিন্তু শরৎ কিছুতেই স্বীকার করছে না।

শরৎ। তা আমি কি করব বল? আমি আবার কবে গল্প লিখলুম।

শান্তি। এই মিথ্যুক! তুমি একটু আগে বললে না?

শরৎ। কি? কি বললুম শুনি?

শান্তি। ইস্! কি মিথ্যেবাদী। নিজেই বল্লো—"জানো, শান্তি, আমি আগে গল্প লিখতাম"—সেই যে কি যেন নাম বল্লে, ছাই! ও! হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—'কাশীনাথ' 'বড়দিদি'—

[গিরীন লাফিয়ে ওঠে।]

গিরীন। এ্যাঁ! বলেছে? শরৎ নিজে বলেছে? "বড়দিদি" গল্প ওর লেখা? কবে বললো?

শান্তি। এই তো খানিক আগে। কিন্তু তোমরা এত লাফাচ্ছ কেন? সামান্য একটা গল্প লিখে কি দোষ করলো, শুনি?

গিরীন। দোষ করেনি?

শান্তি। মোটেই না! আমার কাকাও তো মনসা মঙ্গলের পাঁচালী থেকে গল্প লিখেছিল। কই তাকে তো কেউ দোষ দেয়নি? আর ও তো সামান্য একটা 'বড়দিদি' না 'ছোড়দিদি' লিখেছে।

[আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলে গিরীন।]

গিরীন। তুমি বুঝতে পারছো না বৌঠান, কার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে! কি করে বুঝবে? আমরাই বুঝতে পারি নি। আজ গোটা বাংলাদেশ যাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে পূজো করবার জন্য, সেই মানুষটা, সেই উল্লুক শরৎটা কি না, আমাদের মত ছোট ছোট মানুষগুলোর সঙ্গে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে।

[আত্মহারা গিরীন আনন্দে কেঁদে ফেলল। তার অবস্থা দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে শান্তি।]

শান্তি। আমি জানতাম, আমি জানতাম, ঠাকুরপো, আমার ঠাকুর দেবতা। কত বড় মানুষটা আমার মত একটা মুখ্যু মেয়েকে পায়ে ঠাঁই দিল। কত বড় দরাজ বুক ওঁর। তোমরা তো জানো না ঠাকুরপো, এই মানুষটাকে লোকে নিন্দে করে, মাতাল বলে। আমি কোথায় যাব গো? দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি শাঁখটা নিয়ে আসি।

[শান্তি ভিতরের দিকে ছোটে পাগলের মত।]

গিরীন। কেন? কেন? শাঁখ দিয়ে কি হবে বৌঠান?

[শান্তি ঘুরে দাঁড়ায়।]

শান্তি। কি যে বলো ঠাকুরপো, কত বড় মানুষটা আমার এই ছোট্ট ঘরে রয়েছে তাঁকে পূজো করবো না ?

[শান্তি ছুটে ভিতরে যায়।]

গিরীন। ঠিক বলেছ বৌঠান। বড়রা এমন করেই ছোটোর সঙ্গে ছোট হয়ে মিশে থাকে।

[শাঁখ বাজাতে বাজাতে ছুটে আসে শান্তি। আছাড় খেয়ে পড়ে শরৎচন্দ্রের পায়ে। শরৎচন্দ্র স্তব্ধ, হতবাক। তার দু চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। গিরীনের চোখও অশ্রুসিক্ত।]

শরৎ। দেখ দেখি, কি ব্যাপার দেখ দেখি। কবে ছোটবেলায় কি দু একটা গল্প লিখেছিলাম, তাই নিয়ে এত হৈ-চৈ! আর সৌরীনটা মহাপাজী হয়েছে। কাঁচা হাতের ছোটবেলার লেখা, ওইসব আবার পত্রিকায় ছাপতে দেয় না কি ? কি মুস্‌কিল!

গিরীন। কাঁচা হাতের লেখা ? কি বলছ শরৎ ? আজ সারা দুপুর ধরে গল্পটা আমি শেষ করেছি, এ লেখা তুমি কাঁচা হাতের বলো ?

শরৎ। থাক্ থাক্ ও সব আলোচনা। ভাল করে পড়াশুনা করতে পারি না। এই ত দেখলে, 'হার্ট' এ্যাটাকের পর ডাক্তার রাত জেগে পড়তে নিষেধ করলেন। না পড়লে

কি ভাল লেখা যায় ভাই। তাই তো লেখা টেকা ছেড়ে দিয়ে ছবি আঁকা ধরেছি।

[হঠাৎ খেয়াল হয়, শান্তি তখনও হাঁ করে শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে জল।]

শরৎ। কি করে মুখপুড়ী! তুই এখনও কাঁদছিস্? যা, ভাল করে চা করে নিয়ে আয়। গিরীনকে খেতে দিবি নে?

[চোখের জল মুছতে থাকে শান্তি।]

শান্তি। ছ্যাখো? সকলের সামনে তুই তোকারী করবে না। বউকে কেউ আবার মুখপুড়ী বলে নাকি?

[সকলে হেসে ওঠে, পরিবেশ কিছু সহজ হয়।]

গিরীন। ঠিক বলেছ বৌঠান। সত্যি, এ তোমার বড় অন্যায় শরৎ।

শরৎ। অনেক দিনের অভ্যাস, ছাড়তে পারি না ভাই। ও মুখপুড়ী যে কোনদিন আমার বৌ হবে একি ভাবতে পেরেছি?

শান্তি। ভাগ্যিস্ হয়েছিলাম, তাই বেঁচে গেলে এ যাত্রায়।

[সকলে হেসে ওঠে।]

শান্তি। তোমরা হাসছো। আমার কিন্তু শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। জ্বর ভাব হয়েছে।

শরৎ। দেখি।

[গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে।]

একি! তোমার তো বেশ জ্বর হয়েছে।

শান্তি। তোমায় অত ভাবতে হবে না। তোমরা বস, আমি চা করে নিয়ে আসি।

৪

গিরীন। না, না, আমরা এখন চা খাব না। রাত হয়েছে। আমি চলি। তোমার শরীর খারাপ, তুমি বিশ্রাম করো।

[গিরীন চলে যায়।]

শরৎ। শান্তি, তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

[শান্তি ভিতরে যায়। শরৎ টেবিল থেকে একটা মোটা বই খুলে পড়তে বসে। বাইরে কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং-ঢং করে দশটা বাজে। শরৎ ড্রয়ার থেকে বোতল ও গ্লাস বার করে গ্লাসে মদ ঢেলে চুমুক দেয়। বইটা হাতে খোলাই পড়ে থাকে। যত রাজ্যের ভাবনা তার মাথায় এসে ভীড় করে। আবার মদ ঢেলে চুমুক দেয়, নেশায় মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। শরৎ ওঠে। ইজেলের কাছে যায়। অর্ধ সমাপ্ত নারী মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পাশে পড়ে থাকা পাত্র থেকে তুলিতে রঙ মেখে ইজেলে আঁচড় কাটে। থেমে গিয়ে নিজের মনেই হাসে। বাইরে একটা পুরুষ কণ্ঠের ডাক শোনা যায়। "শরৎ আছো," "শরৎ"।]

শরৎ। কে? চ্যাটার্জি নাকি?

নেপথ্য কণ্ঠ। হ্যাঁ, নীচে এসো।

[ভিতর থেকে ছুটে আসে শান্তি, তাকে দেখে বেশ অসুস্থ মনে হয়।]

শান্তি। এত রাত্রে কে ডাকছে গো?

শরৎ। চ্যাটার্জি।

শান্তি। কেন বলত?

শরৎ। কি জানি।

শান্তি। বুঝতে পেরেছি। মদ খেতে ডাকছে। ওই চ্যাটার্জ্জিই তোমার সর্বনাশ করবে।

শরৎ। আঃ শান্তি! ছি:! কোন ভদ্রলোক সম্বন্ধে ওরকম কথা বলতে নেই। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। আমি একটু বেরুচ্ছি।

শান্তি। কেন?

শরৎ। ছিঃ শান্তি। আমি ছেলেমানুষ নই, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝি।

[দ্রুত বেরিয়ে যায় শরৎ। ভিতর থেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে শিশুটা, শান্তি দ্রুত ছুটে যায় ভেতরে। ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করে। একটু পরে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। উন্মত্তের মতো বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাকতে থাকে— "বাবা", "বাবা"। ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায় শান্তি। হরিহরের কণ্ঠ শোনা যায়—"কি হয়েছে রে শান্তি? এঁ্যা? কি হয়েছে?" হরিহরের হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে প্রবেশ করে শান্তি।]

হরি। কি হয়েছে বল্‌। অমন করছিস্‌ কেন?

শান্তি। সর্বনাশ হয়েছে বাবা, খোকার প্লেগ হয়েছে।

[শিশুটা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে, চীৎকার করে ওঠে হরিহর।]

হরি। এঁ্যা! কি বলছিস্‌ তুই?

শান্তি। আমি ঠিক বলছি বাবা, ওর গলা আর দুই বগলের নীচে ফুলে উঠেছে।

হরি। সে কিরে!

শান্তি। হ্যাঁ বাবা, আর এই দ্যাখো আমারও গলার কাছে ফুলে উঠেছে।

হরি। দেখি!

[হরিহর পরীক্ষা করে দেখেই আর্তনাদ করে ওঠে।]

হরি। হায় ভগবান! একি হলো! চারদিকে প্লেগ হচ্ছে। গতকাল ছুতোর মিস্ত্রির মেয়ে বাতাসি মারা গেল। তারও ঠিক এমনি হয়েছিল। ও যুধিষ্ঠির, ওরে ও শীতল—ওরে, তোরা সকলে আয়রে! আমার সর্বনাশ হয়ে গেলরে। শরৎ কই? শরৎ?

শান্তি। বাইরে গেলেন।

হরি। তাকে বলিস নি?

শান্তি। আগে বুঝতে পারিনি।

হরি। দেখি তোর গা টা আর একবার?

[হাত দিয়ে গা দেখে।]

উঃ! এ যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে। এখন আমি কি করি।

[হুড় মুড় করে ঢুকে পড়ে শীতলচাঁদ ও যুধিষ্ঠির।]

শীতল। কি হয়েছে।

যুধিষ্ঠির। কড়া হলা।

হরি। আমার শান্তির আর খোকার দুজনেরই প্লেগ হয়েছে।

শীতল। প্লেগ হয়েছে? সেকি?

হরি। শরৎ বাড়ী নেই, আমি এখন কি করি?

শীতল। যুধিষ্ঠির আয় আমার সঙ্গে। হাসপাতালে খবর দিতে হবে।

[দ্রুত বেরিয়ে যায় দুজনে।]

হরি। শান্তি, মা তুই শুয়ে পড় গিয়ে। আর দাঁড়িয়ে থাকিস না।

শান্তি। আমাদের কি হবে বাবা?

[প্রায় কেঁদে ফেলে।]

হরি। ভগবানকে ডাক্ মা। ভগবানকে ডাক্। নারায়ণ নারায়ণ। ডাক্, ডাক্ মা নারায়ণকে ডাক্।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পিতার সঙ্গে নারায়ণকে ডাকতে থাকে শান্তি "নারায়ণ, নারায়ণ"। ওরা ভিতরে যায়। মঞ্চের স্তিমিত আলোটা কাঁপতে থাকে। সেই কম্পিত আলোকে অন্তর ও বাহির থেকে শুধু একটি শব্দ বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, "নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।" বাইরে এ্যাম্বুলেন্স আসবার শব্দ শোনা যায়। সিঁড়িতে অনেকগুলি পদশব্দ দ্রুত এগিয়ে আসে। প্রবেশ করে গিরীন, যুধিষ্ঠির ও শীতলচাঁদ।]

গিরীন। এতক্ষণ আমরা থেকে গেলাম, তখন ত বৌঠান আমাদের কিছু বললো না, কোথায় তারা?

[সকলে মিলে দ্রুত অন্দরে প্রবেশ করে। ভিতরে সকলের মিলিত কথার শব্দ শোনা যায়। একটু পরে ওরা ধরাধরি করে শান্তিকে বার করে আনে। কাপড়ে মোড়া শিশুটি যুধিষ্ঠিরের কোলে।]

গিরীন। তোমরা ওদের সাবধানে গাড়ীতে করে নিয়ে যাও। আমি শরতের জন্যে অপেক্ষা করি। শরৎ এলে তাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

[সকলে প্রস্থান করে। গিরীন উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। হাসপাতালের গাড়ী চলে যায়। মঞ্চ নিস্তব্ধ হয়। গিরীন ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়। সাময়িক স্তব্ধতা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা গুঞ্জন ও দূরাগত কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রুতি-গোচর হয় না। হঠাৎ দড়াম্ করে দরজা খুলে যায়। গিরীন চমকে ওঠে। সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় শরৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করে। মনে হয়, কে যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে।]

গিরীন। একি শরৎ? কি হয়েছে তোমার?

[শরৎ ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করতে বলে।]

শরৎ। চুপ চেঁচিও না। পুলিশে শুনতে পাবে।

গিরীন। কেন? কি করেছ তুমি?

শরৎ। আমি মানুষ খুন করেছি।

[গিরীন চীৎকার করে ওঠে।]

গিরীন। শরৎ।

শরৎ। হ্যাঁ, আমার শাস্তি আমায় নিষেধ করেছিল। আমি তো ওর নিষেধ শুনিনি।

গিরীন। শাস্তি তোমায় কি নিষেধ করেছিল?

শরৎ। মদ খেতে। হ্যাঁ, মদ খেতে। আমি তো শুনিনি। চ্যাটার্জী ডাকলো, আর আমি ওর সঙ্গে চলে গেলাম পো-কিনের বাড়ী। পোকিনের হার্টের অসুখ। ডাক্তার ওকে মদ খেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আমি আর চ্যাটার্জী, জোর করে ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মদ খাওয়ালাম। তুমি জানো গিরীন? তুমি জানো, তারপর কি হোল?

গিরীন। বল, বল। তারপর কি হোল তাড়াতাড়ী বল।

শরৎ। এঁ্যা? হাঁ। তারপর শোন। পো-কিন প্রথমে এক পেগ খেলো। তারপর আবার এক পেগ খেল। ও ভুলেই গেল যে ওর হার্টের অসুখ। ডাক্তার বলেছে—মদ খেলে ওর খুব খারাপ হবে। ও কি করলে জানো গিরীন? ও কি করলে জানো?

গিরীন। ও কি করলে তাড়াতাড়ি বলো। একদম সময় নেই এদিকে।—

শরৎ। ও মদের বোতলটা জোর করে কেড়ে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে সবটা মদ গলায় ঢেলে দিলে।

গিরীন। এঁ্যা!

শরৎ। অমনি আঁ, আঁ করে ও ঢলে পড়ে গেল। সকলের ঘুম ভেঙে গেল। ওর বৌ ওর ছেলেমেয়েরা সকলে হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে ওর গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গিরীন, গিরীন, ততক্ষণে পো কিন মরে গেছে।

[গিরীন চীৎকার করে ওঠে।]

গিরীন। শরৎ!

[উদ্বেল কান্নায় ভেঙে পড়ে শরৎ।]

শরৎ। জীবনে আর কোন দিন আমি মদ খাবো না গিরীন। বল, বল মদ খাইয়ে একটা মানুষকে খুন করে ফেলবার পরেও কি কোন ভদ্রলোক মদ খেতে পারে গিরীন?

[গিরীনের কোলের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে শরৎ। গিরীন স্তব্ধ, বিমূঢ়, সে একটাও কথা বলে না। নিথর স্তব্ধতা যেন দুটী প্রাণীকে গ্রাস করতে আসে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায় গিরীন। শরতের ঢলে পড়া মাথাটাকে টেনে তোলে।]

গিরীন। আরও একটা ভীষণ খবর তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে শরৎ। তোমার স্ত্রী, আর তোমার খোকা, দুজনেরই একসঙ্গে প্লেগ হয়েছে। একটু আগে তাদের হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

[শরৎ তখনও ক্যাল ক্যাল করে গিরীনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর কথার একটি বর্ণও যেন ওর বোধগম্য হয় না। গিরীন ওকে ঝাঁকানি দেয়।]

শরৎ, কথা বলো, শরৎ—

[শরৎ উন্মাদের মত বিড় বিড় করে কথা বলে।]

শরৎ। শান্তি, আমার শান্তি, আমার —

[শরৎ ভিতরে ছোটে। সেখান থেকেও আওয়াজ আসে "শান্তি—আমার শান্তি"—বিকট চিৎকার করে শরৎ আছড়ে এসে মঞ্চে পড়ে। তীব্র আর্তনাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন হাহাকার করে ওঠে। মঞ্চ ঘোরে।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[অন্ধকারে ঘোষণা ভেসে আসে,—"মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধানে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তি ও শিশুপুত্র মারাত্মক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শরৎচন্দ্র পাগলের মত হয়ে যান। রেঙ্গুনের জীবন তাঁর কাছে বিষময় হয়ে ওঠে। তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি ফিরে আসেন বাংলাদেশে। উদ্‌ভ্রান্তের মত গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র হাজির হন, মেদিনীপুরের একটি গণ্ডগ্রামে কৃষ্ণদাস বৈরাগীর আখড়ায়। সেখান থেকে কৃষ্ণদাস বৈরাগীর কন্যা মোক্ষদাকে জীবন সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করে, শরৎচন্দ্র আবার ফিরে আসেন বার্মায়।

বোটাটাং এর বস্তীবাড়ী ছেড়ে, রেঙ্গুনের ৩৬নং গলিতে নতুন বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন শরৎ ও মোক্ষদা। সেখানে তাঁদের আর একটা সঙ্গী জুটেছে।—

চাকর ভোলা।"—

ঘোষণাটি শেষ হলে মঞ্চে আলো জ্বলে।

শরতের বর্তমান গৃহসজ্জা আগের চেয়ে উন্নত ধরনের। ঘরে আছে শান্তির একটি তৈল চিত্র। সন্ধ্যা সমাগত। দূরে প্যাগোডা থেকে সন্ধ্যাকালীন উপাসনা ও ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। অন্দর থেকে মোক্ষদা শঙ্খে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে আসে। হাতে একটি ফুলের মালা। সযত্নে মালাটি শান্তির বাঁধানো ছবিতে পরিয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মোক্ষদা। তারপর চাকর ভোলার উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়।]

মোক্ষদা। ভোলা, ভোলা—এই ভোলা।

[ভোলা প্রবেশ করে। গাট্টা গোট্টা যুবক]

ভোলা। কী বলছ?

মোক্ষদা। গিরীন ঠাকুরপোকে খবর দিয়েছিস বাবা?

ভোলা। দিয়েছি।

[ভোলা চলে যাচ্ছিল।]

মোক্ষদা। একী! তুই চলে যাচ্ছিস কেন? গিরীন ঠাকুরপো কি বললেন?

ভোলা। বললে, ভাবনার কি আছে? বাবুর তো ওই রকমই রীতি। আর তোমারেও বলি মা ঠাকরুণ—তুমি বড্ড উতলা হও।

মোক্ষদা। উতলা হবো না? বলিস কি ভোলা? মানুষটা সকাল-বেলায় রোগী দেখতে যাবার নাম করে বেরিয়েছে। সন্ধ্যা উতরে গেল। এখনও ফেরার নাম নেই। সারাটা দিন উপোস, এখনো তুই বলছিস, উতলা হবো না?

ভোলা। আরে বাপু উতলা হয়ে কিছু ফয়দা আছে? চিরকেলে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে মানুষ।

মোক্ষদা। তোকে কি আমি বক্তিতে করবার জন্য ডাকলাম ভোলা। বাবুর আদর পেয়ে পেয়ে তুই একেবারে মাথায় চেপে বসেছিস। গিরীন ঠাকুরপো কি বললেন, বলবি তো?

ভোলা। খুঁজতে বেরিয়েছেন তেনারা।

[ভোলা হন্‌হন্‌ ক'রে দরজার দিকে যায়। প্রবেশ করে গিরীন।]

ভোলা। এই তো গিরীনবাবু এসে গিয়েছেন। ওনারেই জিজ্ঞাসা করো।

গিরীন। কি ব্যাপার! বৌঠান?

মোক্ষদা। আপনার বন্ধু সকালে বেরিয়েছেন। এখনো বাড়ী ফেরেন নি।

গিরীন। এটাতো শরতের পক্ষে নতুন কিছু নয় বৌঠান।

মোক্ষদা। কেন এরকম হোল ঠাকুরপো? আমার বাবা জোর করে আমাকে ওনার ঘাড়ে না চাপালেই পারতেন।

[মোক্ষদার কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে।]

গিরীন। একী? একী? বৌদি, আপনি এমন বিচিলিত হচ্ছেন কেন? আমি বঙ্গকে পাঠিয়েছি লাইব্রেরীতে খোঁজ করতে. বোধহয় সে লাইব্রেরীতেই আছে।

মোক্ষদা। বাড়ীতে তো সব সময়েই পড়াশুনা করছেন। আবার বাইরে গিয়ে না পড়লেই নয়?

[হেসে ওঠে গিরীন]

গিরীন। কি যে বলেন বৌঠান। ওর কি পড়াশুনা না করলে চলে। অতবড় একজন নামকরা সাহিত্যিক। না পড়লে কি লেখা যায়?

মোক্ষদা। কি হবে নাম দিয়ে ঠাকুরপো? দেহই যদি ভেঙ্গে পড়লো। আর অত অত্যাচারে কি শরীর থাকে!

গিরীন। কথাটা ঠিক। কিন্তু উপায় কি? যে সইতে পারে, ভগবান তাকেই আঘাত দেন। আঘাত যে ওর দরকার বৌঠান। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বৌ-ছেলে চোখের ওপর ম'রে গেলো। যখনই আসি,—

[হঠাৎ বাইরে থেকে শরতের কণ্ঠ শোনা যায় "বড়-বৌ"—]

মোক্ষদা। ওই উনি এসেছেন।

[দুজনেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। প্রবেশ করে শরৎ। ক্লান্ত চেহারা। মলিন পোষাক। রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশ।]

মোক্ষদা। আচ্ছা তুমি কি বলতো? আর কত কষ্ট তুমি আমায় দেবে? গরীবের মেয়ে লেখাপড়া জানি না, রূপ নেই, গুণ নেই। কিন্তু আমাকেত তুমি ঘরে এনেছ। একটা পাখী পুষলেও মানুষের তার ওপর দরদ থাকে।

শরৎ। এই দেখো, এই দেখো। তুমি রাগ করছ কেন বড়বৌ! আমি লাইব্রেরীতে বই পড়ছিলাম। বঙ্ক গিয়ে বললো তুমি ভাবছো, তাই—

মোক্ষদা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি বই পড়ছিলে? আমাকে তুমি বোকা পেয়েছ? অতই যদি হতচ্ছেদা করো, তবে আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।

শরৎ। এ-হেহে। তুমি বড্ড রেগে গেছ।

গিরীন। আমি তো আপনাকে বললাম বৌঠান, শরৎ লাইব্রেরীতে আছে।

মোক্ষদা। আপনি থামুন ঠাকুরপো। ও নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুক, যে ও সকাল থেকে বই পড়ছিল।

গিরীন। বল, বল শরৎ। বুকে হাত দিয়ে বল।

শরৎ। ঠিক আছে। আমি বুকে হাত দিয়ে বলছি। আমি সকাল থেকে লাইব্রেরীতে বসে বই পড়িনি।

গিরীন। এ্যাঁ!

মোক্ষদা। হাঁ। এইবার নিজের মুখেই শুনুন।

[দুমদুম ক'রে মোক্ষদা চ'লে যায়।]

গিরীন। তবে কি করছিলে সকাল থেকে?

শরৎ। সকাল বেলায় ডাকে কলকাতা থেকে একটা চিঠি এসেছিলো। চিঠিটা পকেটে করে আমি ইরাবতীর ধারে গিয়ে একটা ছায়ামতন জায়গা দেখে বসেছিলাম। চিঠিটা পড়েছিলাম দশবার। আর চিন্তা করেছিলাম দুঘণ্টা।

গিরীন। কার চিঠি এলো, —কি এমন চিঠি এলো,—যে তোমাকে দশবার পড়ে দুঘণ্টা চিন্তা করতে হোল?

শরৎ। বুড়ির।

গিরীন। বুঃ—ও? তোমার সেই নিরুপমার?

শরৎ। হাঁ।

গিরীন। কি লিখেছে?

শরৎ। আমার যে সমস্ত গল্প উপন্যাস "যমুনায়"—"ভারতীতে" বেরোচ্ছে,—সেগুলো পড়ে তিনি মহাখাপ্পা হ'য়ে গেছেন।

গিরীন। তোমার অপরাধ ?

শরৎ। তিনি লিখেছেন,—গল্প উপন্যাসে বাল-বিধবাদের নিয়ে অত নাড়াচাড়া না করলেই ভাল হয়।

গিরীন। কারণ ?

শরৎ। কারণ, তিনিও একজন বাল-বিধবা। তুমি বলতে পারো গিরীন, কৈশোরের স্মৃতি যার একটা বিধবার কান্নায় কণ্টকিত। যৌবনের প্রথম প্রেম যে নিবেদন করলো, একটা বিধবা যুবতীকে, তার লেখা গল্পের নায়িকা যদি বাল-বিধবা না হয়,—

[শরতের কথা শেষ হয় না, একথালা খাবার নিয়ে প্রবেশ করে মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। খালি পেটে আর বকর বকর করতে হবে না। না খেয়ে খেয়ে ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে। বলি নদীর ধারে বসে, কোথাকার কোন বিধবার চিন্তা করবার আগে আমার সিঁথির সিঁদুরের কথাটাও ভেবো।

[খাবারের থালা টেবিলে নামিয়ে রাখে মোক্ষদা। উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে শরৎ ও গিরীন।]

মোক্ষদা। আজ আবার কোন বিধবার চিন্তা করছিলে নদীর ধারে বসে বসে,—শুনি ?

শরৎ। কামিনী।

গিরীন/মোক্ষদা। কা-মি-নী।

গিরীন। সে কে?

শরৎ। বিধবা।

[শরৎ চুপ করে খাদ্যে মন দেয়। মোক্ষদা ও গিরীন বিস্ময়ে শরতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

গিরীন। কি বলছ তুমি? কামিনী আবার কে?

শরৎ। কি আশ্চর্য্য! বড় বৌ তুমিও ভুলে গেলে! কাঁচড়াপাড়ার শীতলচাঁদ, আমাদের বোটাটাং এর বস্তী বাড়ীতে কামিনীকে নিয়ে থাকতো। তারপর—

মোক্ষদা। ও হ্যাঁ। হ্যাঁ। শেতলচাঁদ, সেই কামিনীর বর। আহা। তাজা টাটকা মানুষটা মায়ের দয়া হয়ে মরে গেল গো। কামিনীকে বড় ভালোবাসতো। সেই কামিনীর কথা বলছো তুমি? সোয়ামী মরে যেতে সে তো বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। সেই কামিনী?

শরৎ। সেই কামিনী। আমাদের অফিসের পাশে যে মেস-বাড়ীতে আগে থাকতাম, সেইখানে গিয়েছিলাম একটা কাজে।

মোক্ষদা। তাই বুঝি? তারপর?

শরৎ। একটা সিগারেট খাবো। পকেটে দেশলাই ছিল না। পাশেই একটা মুদির দোকান। দেশলাই কিনতে ঢুকলাম। দেখি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দোকানদারী করছে কামিনী।

মোক্ষদা। এ্যাঁ! বল কি গো? তারপর?

শরৎ। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। এক গা গয়না।

মোক্ষদা। বল কি গো? বিধবা মাগীর এক গা গয়না। আবার রূপ। গলায় দড়ি জোটেনি?

শরৎ। এখন আর সে বিধবা নেই বড় বৌ।

গিরীন। শরৎ !!

মোক্ষদা। কি বলছো তুমি ?

শরৎ। শীতলচাঁদের মামাতো ভাই নিবারণ, সেই যে গো শীতলের অসুখের সময় টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো—সেই বিয়ে করেছে কামিনীকে।

মোক্ষদা। মুখে আগুন অমন মেয়েছেলের। শোন গিরীন ঠাকুরপো, তুমি তো সব ব্যাপার জানো না। ওই কামিনী মাগীর কাঁচড়াপাড়ায় একবার বিয়ে হয়েছিল। তারপর শীতলচাঁদের সঙ্গে ভাব করে; তাকে নিয়ে রেঙ্গুনে পালিয়ে আসে। একটা দিনের জন্যও পুরানো স্বামীর কথা মুখে আনতে শুনিনি। শীতলচাঁদের সঙ্গে কত সোহাগ, ঢলাঢলি। এক গেলাসে জল ঢাললে দুজনের মুখে পড়ে। শীতলচাঁদ মরে যেতে সে কি কান্না মাগীর। তারপর একদিন তোমার বন্ধু এসে বললেন,—কামিনী কোথায় চলে গেছে, তার ঘরে তালা ঝুলছে। আমরা ভাবলাম বুঝি স্বামীর শোকে ইরাবতীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে। ও মা! তা নয়! শেষ কালে হিন্দুর বিধবা আর একটা নিকে করে বসে রইল। কি ঘেন্নার কথা বাপু!

শরৎ। তুমি ঘেন্না করছো বড় বৌ। আমি কিন্তু পারছি না।

মোক্ষদা। আর জ্বালিও না বাপু। তুমি এক আশ্চর্য মানুষ।

শরৎ। এই সংসারটাও বড় আশ্চর্য যায়গা বড়বৌ। শীতলচাঁদের সংসারে কামিনীকে দেখেছি। সেখানে কি সুখেই না সে ছিল। সেই কামিনীকে আবার দেখেছি শীতলচাঁদের রোগশয্যার পাশে। অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তাকে দেখলাম নিবারণের ঘরে। সে পোড়াকাঠ আর নেই। অসাধারণ লাবণ্যে তার চোখ মুখ ভরা।

গিরীন। তুমি ঠিক বলেছ শরৎ। কামিনীর জীবনে একদিকে যেমন শীতলচাঁদ সত্য, তেমনি আর একদিকে নিবারণও সত্য। কাঁচড়াপাড়ায় প্রথম যে স্বামীটিকে সে ছেড়ে এসেছিল — তাকেও কি কামিনী কম ভালবাসতো ?

মোক্ষদা। তুমিও এই কথা বলছ ঠাকুরপো ? তা হবে। তোমরা সবাই সমান। তোমরা অনেক লেখাপড়া শিখেছ। তোমাদের কথা আমি বুঝে উঠতে পারি না।

[শব্দ করে হেসে ওঠে গিরীন ও শরৎ।]

শরৎ। বোঝবার দরকারও নেই। তুমি যেটা বোঝ সেটাই শোন। তোমার বাবাকে ঠিক সময়মত টাকা পাঠিয়েছিলাম, মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরে এসেছে।

[আনন্দে উদ্বেল হয় মোক্ষদা]

মোক্ষদা। ফিরে এসেছে ? আমার বাবা নিজে সই করেছে, রসিদে ? তা হলে আমার বাবা বেঁচে আছে ?

গিরীন। ছিঃ, ছিঃ একথা তুমি কেন বলছো বৌঠান—বেঁচে থাকবেন না কেন?

মোক্ষদা। আমার বড় ভয় করে ঠাকুরপো। বিয়ের পর সেই যে বাবাকে ছেড়ে স্বামীর হাত ধরে চলে এসেছি, সেই থেকে আমার বাবাকে দেখিনি। আমার বাবা বড় দুঃখী ঠাকুরপো। দুনিয়ায় আমি ছাড়া তার কেউ নেই।

গিরীন। তুমি এত ভেবোনা বৌঠান। যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। আর কেউ না থাকে গ্রামের লোকেরাই তোমার বাবাকে দেখবে।

মোক্ষদা। ঝাঁটা মারি অমন গাঁয়ের লোকের মুখে। এমন শয়তান আর এমন নীচ, যে আমার দেবতার মত বাবাকে পর্যন্ত তারা একঘরে করেছে।

গিরীন। সে কী? তোমার বাবার অপরাধ?

মোক্ষদা। অপরাধ,—(শরৎকে দেখিয়ে) এই পাগলা শিবটার গলায় আমি মালা দিয়েছি। এঁর জাত জন্ম দেখিনি। বিয়ের সময়ে ঘটা ক'রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইনি। কাউকে খবর দেবার সময় পাইনি।—

গিরীন। সে আবার কী, খবর দেবার সময় পাওনি কেন?

মোক্ষদা। এই মানুষটার জন্য। একমুখ দাড়ি, ময়লা জামা-কাপড়। মাথার চুলে বোধহয় ছমাস তেল পড়েনি, ভবঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলেন, আমাদের শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। কোথায়

রাত কাটাবেন। চল, কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ায়। আর আমার বাবা আবার এনার ওপর এককাঠি। যে আসবে তাকেই বলবে, এই মেয়েটা আমার গলায় কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। একে বিয়ে করে আমাকে বাঁচাবে?

গিরীন। তারপর?

মোক্ষদা। এই পাগলার কাছেও বলে ফেললেন সেই কথা। বহুদিন বহুলোককে বলেছেন, ওই এক কথা। কেউ ঘুরেও দেখেনি।

গিরীন। তারপর?

মোক্ষদা। এই বাউণ্ডুলের যে পেটে পেটে এত ছিল, আমি কি করে জানবো? ঝট করে বলে বসলেন,—আপনারা ব্রাহ্মণ? বাবা বললেন হ্যাঁ। অমনি বলে বসলেন, আমি বিয়ে করবো। আমি তো লজ্জায় মরে যাই। কোথায় পালাবো, কোথায় লুকাবো নিজেকে কিছুই ঠিক করতে পারি না।

গিরীন। অদ্ভুত তো!

মোক্ষদা। অদ্ভুত মানে? শোনই না। আমার বাবা তো আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, তা'হলে আমি উদ্যোগ আয়োজন করি। পাঁজি-টাজি দেখি? ওমা! এই পাগলটা কি বললে জানো? বললে,—ওসব পাঁজি-টাজি রেখে দিন। পরশুর জাহাজে, আমি রেঙ্গুন যাচ্ছি। আজ রাত্রেই বিয়ে করে কাল কলকাতায় ফিরবো। পরশু চলে যাব রেঙ্গুনে।

গিরীন। তোমার বাবা রাজী হলেন ?

মোক্ষদা। বললাম না ? আমার বাবা ওনার উপরে এককাঠি। বললেন,—সাক্ষী রইলেন ইষ্ট দেবতা, সাক্ষী রইল আকাশ আর মাটি ;—আমি এর বাবা। আমি একে সম্প্রদান করছি তোমার হাতে। শুধু একটা কথা মনে রেখো বাবা। দুনিয়ায় এই মেয়ে ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

[প্রায় কেঁদে ফেলে মোক্ষদা]

গিরীন। একি তুমি কাঁদছো কেন ? আমি বুঝতে পারছি। সমাজের লোকজন ডেকে তোমাদের বিয়ে হয়নি বলে, সমাজ তোমার বাবাকে অপমান করেছে। কিন্তু তুমি কি ঠকেছ ? সেদিনের সেই অজ্ঞাতকুলশীল, ছন্নছাড়া, চিরদুঃখী মানুষটার জীবনের জ্বালা তুমি ছাড়া আর কে জুড়োতে পারত বৌঠান ?

মোক্ষদা। আমার সাধ্য কি ঠাকুরপো, ওঁর জ্বালা জুড়োই ? রোজ রোজ নিজের মধ্যে যে নতুন নতুন জ্বালার সৃষ্টি করে চলেছে, তাঁর সঙ্গে জ্বলেপুড়ে মরা ছাড়া আর আমার কি করার আছে ঠাকুরপো ?

[যে অনবদ্য অভিব্যক্তিতে মোক্ষদা এই অতি কঠিন সত্যটি প্রকাশ করলো, তাতে শুধু গিরীন নয়, স্বয়ং শরৎচন্দ্রও বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকে উঠে তার দিকে তাকালো। নিরেট স্তব্ধতা এই মুহূর্তটিকে ভাস্বর করে তুললো। মঞ্চের আলো কমতে কমতে এক সময় নিভে গিয়ে রাত্রির ছিদ্রবিহীন অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটি অস্পষ্ট কোলাহলের মধ্যে মঞ্চে আবার অতি ক্ষীণ আলো জ্বললো, দেখা গেল শরৎ ও মোক্ষদা নিদ্রামগ্ন। কোলাহল ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে—"আগুন, আগুন, বাঁচাও, বাঁচাও।" শব্দগুলি কানে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো মোক্ষদা। ঠেলে ঠেলে শরৎকে তুললো।]

মোক্ষদা। বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ওগো শুনছো? বাড়ীতে আগুন। ওগো শুনছো?—

[ত্বরিতে উঠে বসে শরৎ। ছুটে দরজার কাছে যায়। ততক্ষণে চীৎকার ও আগুনে কাঠপোড়ার শব্দ প্রকট হ'য়েছে। বাইরের দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক আগুন দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। মোক্ষদা শরৎকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে। ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। শরৎ মোক্ষদাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে—বাইরে ছোটে। একটা ছাগলের আর্ত চীৎকার শোনা যায়।]

শরৎ। ছাগলটা বাঁধা রয়েছে নীচে। ও বোধহয় এতক্ষণে পুড়ে গেল।

(ছুটে বেরিয়ে যায় শরৎ। হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে মোক্ষদা। ততক্ষণে দরজা জানালা দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ছাগলের ডাক নীরব হ'য়ে গেছে। ভীত সন্ত্রস্ত মোক্ষদা পাগলের মত জামা কাপড় প্রভৃতি একটা পোঁটলায় বাঁধবার চেষ্টা ক'রছে। এমন সময়ে ঝড়ের মত প্রবেশ করে শরৎ।]

শরৎ। ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমার বইগুলো ? বড় বৌ, আমার লেখাগুলো ?

[সে খাটের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করবার চেষ্টা করে। আগুনের লেলিহান শিখা ততক্ষণে সমগ্র ঘরখানাকে গ্রাস করে ফেলেছে। মোক্ষদা উন্মাদের মত শরৎকে টেনে খাটের তলা থেকে বার করে নিয়ে আসে। শরতের কণ্ঠে একই কথা—

শরৎ। আমার বইগুলো বার করতে পারলাম না। সব পুড়ে গেল।

[বাইরে তখন দমকলের তীব্র ঘণ্টাধ্বনি সুরু হয়েছে। আলো কমতে থাকে। কোলাহল স্তিমিত হতে থাকে। শুধুমাত্র শরৎ ও মোক্ষদার আর্ত বিলাপ শোনা যায়।]

শরৎ। আমার সব গেল বড় বৌ। বছরের পর বছর ধরে যা আমি যোগাড় করলাম, সব ছাই হয়ে গেল।

মোক্ষদা। আবার হবে গো। আবার হবে। আবার তুমি লিখবে। তোমার হাত আছে। তোমার কলম আছে।

শরৎ। তুমি জানো না বড় বৌ—কি পুড়ে গেল ?

মোক্ষদা। কি পুড়ে গেল ?

শরৎ। পুড়ে গেল আমার "চরিত্রহীন", পুড়ে গেল আমার "নারীর মূল্য"। আমার মান-সম্ভ্রম, আমার বংশ মর্যাদা, টাকা-পয়সা, সব কিছুর বিনিময়ে বছরের পর বছর পতিতা-

পল্লীর কক্ষে কক্ষে ঘুরে ছয় সাতশ' লাঞ্ছিতা মেয়ের করুণ কাহিণী আমি যোগাড় করেছিলাম। ওদের ইতিহাস লেখা ছিল ওই খাতাগুলোতে। তুমি জানো না বড় বৌ, কি নিদারুণ অপমান মানুষ সেদিন আমাকে ক'রেছে। কিন্তু হাজার হাজার মেয়ের কান্না আমি কিছুতেই এড়াতে পারিনি।—আজও আমি ভুলতে পারি না—

[শরতের কণ্ঠ ছাপিয়ে শোনা যায় নূপুরের আওয়াজ। সেই আওয়াজ উচ্চ গ্রামে ওঠে। মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

।। পঞ্চম দৃশ্য ।।

[সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল অধ্যুষিত একটা গ্রামে জরীপের কাজ চলেছে। বনেলী এস্টেটের কুমার বাহাদুর সরেজমিনে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে এসেছেন। তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য শিকার এবং অবসর বিনোদন। শিকারের তাঁবু পড়েছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে। ওই সময়কার একটি অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় তাঁবুর অভ্যন্তরে কুমার বাহাদুর বিলাস রজনী যাপনে ব্যস্ত। কুমার বাহাদুর সুঠাম, দিব্যকান্তি। পরণে ঢিলে-ঢালা অবসরকালীন পোষাক। কুমারের সামনে উন্মাদের মত নেচে চলেছে একটা রমণী। তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন কুমার বাহাদুর। নৃত্যের তাল ফেরতায় প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা নত করে রমণী। উচ্ছসিত কণ্ঠে "বাহবা—বাহবা" করে ওঠেন কুমার বাহাদুর। সেলাম করে মদের গ্লাস কুমারের দিকে এগিয়ে দেয় রমণী। এক হাতে মদের গ্লাস নিয়ে আর এক হাতে রমণীকে কাছে টেনে নেন কুমার বাহাদুর। কুমারের কোলে শুয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে রমণী। কুমারের মুখ নেমে আসে রমণীর মুখের দিকে। কুমারকে ঠেলে দিয়ে হাসতে হাসতে উঠে পড়ে রমণী। বাইরে তখন বেজে চলে সারেঙ্গী আর তবলা। রমণী আবার নাচতে শুরু করে। মদের পাত্র নিঃশেষ করে কুমার আবার চেঁচিয়ে ওঠেন "বাহবা-বাহবা", ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে "বাহবা, বাহবা

বাইজী" বলতে বলতে প্রবেশ করে তরুণ শরৎচন্দ্র। বয়স তার বাইশ/তেইশ। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় রমণী। চমকে ওঠে শরৎ। মুহূর্তের জন্য শরৎ ও রমণী বিহ্বল ভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রমণীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে যায়।]

রমণী। একী! তুমি!

[ততক্ষণে কুমার ওদের দিকে তাকিয়েছেন।]

কুমার। আরে! শরৎ এসে গেছো? এসো, এসো।

শরৎ। না এসে আর উপায় কি হুজুর। আপনি নিজে যখন আমাকে স্মরণ করেছেন।

[অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যায় শরৎ।]

কুমার। এস শরৎ, বোস। বন্দুক এনেছো তো?

শরৎ। নিশ্চয়ই এনেছি হুজুর। শিকারে আসবো আর বন্দুক আনবো না।

কুমার। বন্দুক তুমি ভালই চালাও। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে ডাকিনি শরৎ। তোমার সঙ্গে শিকার করে বড় আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বড় সুন্দর কথা বল।

শরৎ। সবই আপনার অনুগ্রহে কুমার বাহাদুর। আপনার কাছে চাকরী করতে এসে বড়ো আনন্দ পেয়েছিলাম হুজুর। বনেলী এস্টেটের নুন খেয়েছি আমি।

কুমার। তবে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে কেন?

শরৎ। কপালের দোষ। এক সাধুবাবার চেলা হ'য়ে পাহাড় পর্বত ঘুরে এলাম একবছর।

কুমার। বহুত আচ্ছা। বহুত আচ্ছা শরৎ। এইজন্যই তোমাকে আমার ভাল লাগে।

[হঠাৎ খেয়াল হয় বাইজী নাচ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একবার রমণীর দিকে আর একবার শরতের দিকে চ'াইলেন।]

কুমার। কিন্তু শরৎ একটা কথার জবাব চাই যে।

শরৎ। হুকুম করুন হুজুর।

কুমার। এই মেয়েটিকে তুমি চেনো ?

[শরৎ স্তব্ধ]

বলো শরৎ চেনো তুমি মেয়েটিকে ?

শরৎ। চিনি হুজুর! ও তো আমারই আবিষ্কার—

কুমার। তোমার আবিষ্কার—! বলছো কি শরৎ ? আমার কি নেশা খুব বেশী হয়ে গেছে ?

শরৎ। হুজুরের নেশা, হুজুরের মতই বনেদি। তালে কথনো ভুল হয় না।

[হো হো করে হেসে ওঠেন কুমার বাহাদুর।]

কুমার। এদিকে এসো তো বাইজী। আমার কাছে এসে বসো।

[মেয়েটি এগিয়ে এসে কুমারের পাশে বসে। কুমার তার কাঁধে হাত রাখেন।]

এইবার ব্যাপারটি খুলে বলতো শরৎ। কোন বন থেকে আবিষ্কার করেছ তুমি, বাগানের এই সেরা ফুলটি ?

শরৎ। একেবারে ঘেঁটু ফুলের জঙ্গল থেকে হুজুর। গোবরে ফুটেছিল এই পদ্মফুল।

কুমার। বহুত আচ্ছা! বড় সুন্দর তোমার রসিকতা শরৎ!

শরৎ। অপরাধ মাপ করবেন হুজুর। রসিকতা আমি করিনি। সত্যিই ঘেঁটু ফুলের জঙ্গলে পঙ্ক পুকুরে ফুটেছিল এই পদ্মফুল। তুলে আনতে বড় কষ্ট হয়েছে হুজুর।

[হেসে ওঠেন কুমার]

কুমার। কি রকম?

শরৎ। ছোটবেলা থেকে ছিঃ ছিঃ শুনতে শুনতে জীবনটাই আমার ছিছিঃ হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোকেরা আমাকে দেখলেই ইজ্জত বাঁচিয়ে দূরে সরে যেতেন। তাই ভদ্রলোকের পাড়া ছেড়ে আমার মত ছিঃ ছিঃ এদের পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম অনেকদিন।

কুমার। অদ্ভুত! অদ্ভুত! তারপর—

শরৎ। অনেক জলে নেমেছি হুজুর। পাঁকে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলাম। এই ফুলটি তখনও ভালো করে ফোটেনি। সবে ফুটি ফুটি করছে। আমি গায়ে হাত দিতে, একে একে পাপড়ি মেলতে শুরু করলো।

[হো হো করে হেসে ওঠেন কুমার বাহাদুর। সলজ্জ হাসিতে শরৎকে ঠেলা দেয় রমণী। সুঠাম দেহবল্লরী দোলায়িত করে বলে—]

রমণী। যাও। তুমি ভারি ইয়ে —

কুমার। শরৎ! তুমি কি কবিতা টবিতা লেখ? তোমার ভাষা-গুলো যেন কি রকম কি রকম মনে হচ্ছে।

[দুকানে হাত দিয়ে আঁতকে ওঠে শরৎচন্দ্র।]

শরৎ। আরে রাম রাম! কী যে বলেন হুজুর। একমাত্র পাষণ্ড ছাড়া কেউ কবিতা লেখে না। কবিতা লিখে কি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মরবো? যেখানে কবিতা আমি সেখানে থেকে দু'শো হাত দূরে। তার চেয়ে হুজুর এই ভালো।

[একপাত্র মদ তুলে দেয় শরৎ কুমারের হাতে। তারপর দুজনেই হেসে ওঠে—। এক চুমুকে পাত্রটি শেষ করে নামিয়ে রাখে কুমার বাহাদুর।]

কুমার। ঠিক বলেছো শরৎ। ওসব কবিতা টবিতা বড় খারাপ জিনিষ।

শরৎ। জ্যান্ত কবিতার মত ভালো জিনিষ তো আপনার পাশেই বসে রয়েছে হুজুর।

[হাসতে থাকে কুমার বাহাদুর।]

শরৎ। তাহলে এবার আপনি বিশ্রাম করুন হুজুর, আমি পরে দেখা করবো।

[শরৎ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।]

কুমার। আরে না না। বসো শরৎ। তুমি না থাকলে কি জমে? তোমার কথায় জাদু আছে। শরৎ, তুমি আবার ফিরে এসো আমাদের এখানে, তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

রমণী। না না। এমন কাজও করবেন না কুমার। মানুষটা একে তো গোল্লায় গেছে তারপর আরও গোল্লায় যাবে।

কুমার। কেন? মাইনে বাড়ালে গোল্লায় যাবে কেন?

রমণী দিনরাত মদ খাবে। আর মেয়েছেলেদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরবে।

কুমার। একি কথা শুনছি শরৎ। তুমি মেয়েছেলেদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘোর?

শরৎ। ঘুরি হুজুর। কিন্তু নিজের জন্য নয়, পরের উপকারের জন্য।

কুমার। তার মানে?

শরৎ। কুসুম চয়ন করতে। পদ্ম তো পঙ্ক ছাড়া ফোটে না। আবার পদ্ম না হলে শক্তিপূজা হয় না। তাইতো কষ্ট করি। তা না হলে কার সাধ বলুন, রাতের অন্ধকারে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে, ফুল তুলতে যাবো?

কুমার। তোমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?

[ঝপাৎ করে রমণীর পায়ে হাত দেয় শরৎ।]

শরৎ। এই মেয়েছেলের পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর। মিথ্যে কথা একটাও বলিনি।

রমণী। ও মা গো। কী অসভ্য!

[সকলে হাসতে থাকে।]

কুমার। খালি পদ্ম পদ্ম বলছো কেন শরৎ? পদ্মে তো গন্ধ নেই। গোলাপ বল না, গোলাপ?

শরৎ। আছে হুজুর। পদ্মেও গন্ধ আছে। শুঁকে দেখুন—আমি চলি।

[রমণীকে কুমারের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রস্থান করে শরৎ। কুমার রমণীকে জড়িয়ে ধরতে যায়। হাসতে হাসতে কুমারের বাহু বন্ধনে ধরা দেয় রমণী।]

কুমার। কি নাম তোমার?

রমণী। নাম নেই।

কুমার। নাম নেই? তবে কি বলে ডাকবো?

রমণী। যা বলে খুশী।

কুমার। যা বলে খুশী। সেকি কখনো হয়? একটা নাম তো চাই।

রমণী। তাহলে দাদাঠাকুরকে ডাকুন। সেই একটা নাম দিয়ে দেবে।

কুমার। দাদাঠাকুর! সে আবার কে?

রমণী। জানেন না বুঝি? আপনার ওই শরৎচন্দ্র। ও তো আমাদের সকলের দাদাঠাকুর। দাঁড়ান ডাকি। দাদাঠাকুর—

[নিজেই ডাক দেয় রমণী। কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র।]

শরৎ। নামের ঝামেলায় যাবেন না হুজুর। ওর একশ আটটা নাম। খেঁদি, বুঁচি, টগরি, টেঁপি, চন্দ্রমুখি, চন্দ্রকলা,

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে ও মেয়েমানুষ। তারচেয়েও বড় কথা ও মানুষ। মানুষ কি তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না হুজুর। হুকুম করেন তো একটা গল্প বলি। তাহলে আপনি নিজেই ওর একটা যুৎসই নাম দিয়ে নিতে পারবেন।

[সকলে হাসে]

কুমার। চমৎকার কথা বল তুমি শরৎ। তোমার গল্প শুনতে আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে।

শরৎ। তাহলে আর এক গ্লাস মদ খান হুজুর। ততক্ষণ গল্পটাকে আমি মনের মধ্যে জমিয়ে নিই।

[একপাত্র মদ ঢেলে কুমারের দিকে এগিয়ে দেয় শরৎ।]

কুমার। তবে তাই হোক! দাও! আর কি যেন তোমার নাম? টগরী, টেঁপি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, তুমি যেই হও। আমার কাছে এসে ঘন হয়ে বোস।

[লাস্যময় হাসিতে মুখর হয়ে রমণী বললো।]

রমণী। আমি একটু অন্দর থেকে আসছি কুমার!

[সেলাম জানিয়ে রমণী বেরিয়ে গেল। কুমার বাহাদুর মদের পাত্র হাতে করে সোজা হয়ে বসলেন।]

কুমার। বল শরৎ। তোমার গল্প বল।

[নেপথ্যে সারেঙ্গিটা একবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। অল্প একটু লহরা তুলে তেহাই দিলো তবলচী। শরৎচন্দ্র গল্প শুরু করলো।]

শরৎ। সেটা ছিল এক অমাবস্যার রাত। আমার এক বন্ধু এসে বললো চল একটু ফুর্তি করে আসি। হাওড়ার ঘোলা-ডাঙ্গার এক পতিতা পল্লীতে দুজনে গিয়ে ঢুকলাম। নোংরা অপ্রসস্ত গলি, গ্যাসের আলোয় বেশ ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। আমরা এগোচ্ছি। হঠাৎ আমাদের পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক ছুটে পালিয়ে গেল। চারিদিক থেকে চিৎকার উঠলো। বন্ধুর কাছে অনেক টাকা ছিল। আমরা ভয়ে উদভ্রান্তের মত ছুটতে লাগলাম। চারিদিকে সে কী চিৎকার আর স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কান্না—

[হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। মঞ্চ ঘুরতে থাকলো। নেপথ্যে চিৎকার আর কান্নার রোল উঠলো। অনেকগুলো লোকের ছুটোছুটির শব্দ শোনা যেতে লাগলো। একটা বন্ধ দরজায় ঘা মারার শব্দের সঙ্গে একাধিক পুরুষ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল,—"খুলুন—দরজা খুলুন, খুলুন।"]

[মঞ্চে স্তিমিত আলো জ্বললে দেখা গেল, পূর্ব দৃশ্যের সেই রমণী। পরণে ব্লাউজ আর—খাটো ঘাগরা। ভিতর থেকে এসে দরজা খুলে দিল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো শরৎচন্দ্র ও তার বন্ধু—নাম শৈলভূষণ। মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো।]

রমণী। একী! কারা আপনারা?

[সুইচ টিপে আলো জাললো মেয়েটি। অপ্রসস্ত ঘর। আসবাব বলতে কিছু নেই। দেওয়ালে কতগুলো ঠাকুর দেবতার ছবি।

মেঝেতে একটা বিছানা ও গোটা দুয়েক তাকিয়া। শরৎচন্দ্র ও শৈলভূষণ তখনও হাঁপাচ্ছে।]

রমনী। কি ব্যাপার? কি হয়েছে আপনাদের?

শরৎ। বলছি আগে একটু বসি।

রমণী। বসুন।

[মেয়েটি ভেতরে গেল।]

র শরৎ। কি করবি? এখানেই বসবি? না আর কোথাও যাবি?

শৈল। না বাবা। আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। যা গোলমাল।

শরৎ। এ পাড়ায় এ রকম হামেশাই হয়। অত ভয় কিসের।

শৈল। ভয়ের কারণ আছে।

শরৎ। কি কারণ?

শৈল। পরে বলবো।

[মেয়েটি আবার ঢোকে এবার তার মুখে হাসি।]

রমণী। বলুন।

শৈল। আমরা রাত্রে এখানে থাকবো।

রমণী। দুজনেই?

শৈল। হাঁ, দুজনেই।

শরৎ। একটুও ভুল করো না ভাই। আমি কিন্তু কাউ। বাবুর লেজুড়—পিছনে পিছনে এসেছি।

[মেয়েটি হেসে ফেললো।]

রমণী। ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। পাঁচ টাকা লাগবে। মদের দাম আলাদা। খাবারের দাম আলাদা। ঝি এর জন্য চার আনা।

শৈল। ঠিক আছে। ঠিক আছে। অত দাম দস্তুর করতে হবে না। এসো।

রমণী। দাঁড়ান। আগে মদ নিয়ে আসি।

[মেয়েটি হাসতে হাসতে ভেতরে চলে যায়। এক বোতল মদ ও তিনটে গ্লাস নিয়ে আসে। শরৎচন্দ্র চিৎকার করে ওঠে।]

শরৎ। জয় শৈলভূষণের জয়! জয় মদের বোতলের জয়! জয় অমাবস্যার রাত্রে কুড়িয়ে পাওয়া পূর্ণিমা সুন্দরীর জয়।

[শৈলভূষণ ও রমণী হেসে ওঠে।]

রমণী। এমা! আমার নাম নাকি পূর্ণিমা। মানুষটা কি বলে দেখ।

[সে গ্লাসে মদ ঢেলে ওদের দেয় নিজেও নেয়। শরৎ মদে চুমুক দিয়ে]

শরৎ। আলবৎ পূর্ণিমা! অমাবস্যার রাত্রে গুণ্ডার তাড়া খেয়ে দিগবিদিগজ্ঞান হারিয়ে যখন ছুটছিলাম, তখন যে আমাদের আলো জেলে ঘরে বসালো, সে পূর্ণিমা না হয়েই যায় না।

[শৈল হেসে ওঠে। মেয়েটির হাত ধরে টান দেয়। ওদের নেশা জমে উঠেছে।]

রমণী। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। ঠিক আছে। না হয় পূর্ণিমাই হলাম। তা এখন কি করবে শুনি।

শরৎ। তোমার নাচ দেখবো, গান শুনবো।

রমণা। নাচ দেখবে। গান শুনবে ?

শৈল। আলবৎ নাচ দেখবো। নাচতে নাচতে তোমার আঁচল দিয়ে আমায় ঢেকে দিও। আমি ঘুমিয়ে পড়বো।

শরৎ। হ্যাঁ তোমার জন্য ও এখন আঁচল তৈরী করবে।

শৈল। কেন ? ঘাগরা ?

শরৎ। ঘাগরার আবার আঁচল হয় নাকি ?

শৈল। আলবৎ হয়। একশবার হয়।

[খিলখিল করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় মেয়েটা। বেজে ওঠে তবলা। অন্দর থেকে নাচের বোল শোনা যায় মেয়েটির কণ্ঠে। তালে তালে বাজে ঘুঙুর। নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে মেয়েটি। তার অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমায় তন্ময় হয়ে যায় শরৎচন্দ্র। মদের গ্লাস তার হাতেই ধরা থাকে। নেশায় আর আমেজে ততক্ষণে ঘোলাটে হয়ে গেছে শৈলভূষণের চোখ দুটো। স্খলিত কণ্ঠে মাঝে মাঝে "বাহবা বাহবা" করে চেঁচিয়ে ওঠে সে। শরতের চোখ দুটো নৃত্যরতা রমণীর পদক্ষেপে নিবদ্ধ। উন্মত্ত নাচের মধ্যে রমণীকে কাছে টেনে নেয় শৈলভূষণ। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

শরৎ। দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। আমি আগে বাইরে যাই।

[স্খলিত পদে বেরিয়ে যায় শরৎ। যাবার সময় আলোটা নিভিয়ে যায়। বাইরে অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ডেকে ওঠে। রাত্রী গভীর হয়। আস্তে আস্তে সমস্ত শব্দ, সমস্ত উন্মত্ততা থেমে আসে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, আর দূরাগত কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এক-সময় মুরগী ডেকে ওঠে। ফিকে এক চিলতে আলো ঘরে এসে পড়ে। দেখা যায় ঘরে শৈলভূষণ ছাড়া আর কেউ নেই। অবিন্যস্ত বসন। সে যেন পাগলের মত চারিদিকে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাইরে জলপড়ার শব্দ হচ্ছে। একসময় শৈলভূষণ চিৎকার করে ওঠে,—"শরৎ, শরৎ। আমার সবনাশ হয়ে গেছে। কোথায় তুমি ;" ঘুম জড়ানো চোখে ত্রস্তপদে প্রবেশ করে শরৎ।]

শরৎ। কি হয়েছে ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

শৈল। কোথায় ছিলে তুমি ?

শরৎ। বাইরে সিঁড়ির নীচে শুয়েছিলাম। কেন ?

শৈল। তুমি আমার টাকার থলে নিয়েছ ?

শরৎ কি বলছ তুমি ? আমি তো রাত্রে আর ঘরে ঢুকিনি। কত টাকা ছিল ?

[হাউমাউ করে কেঁদে উঠে শৈলভূষণ।]

শৈল। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে শরৎ। তিন হাজার টাকা একটা থলেতে করে কোমরে বেঁধে রেখেছিলাম। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। সেই মেয়েছেলেটাও উধাও।

শরৎ। কি বলছো তুমি ? তার নিজের বাড়ী থেকে সে উধাও হবে কেন ?

৭

শৈল। টাকার থলি চুরি করে। হারামজাদী কম শয়তান। কাল সারারাত ঢলানি করলো। কত আদর সোহাগ দেখালো। আবার সকাল হতে না হতেই আমার তিন হাজার টাকা নিয়ে উধাও। হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল শরৎ! মহাজনের টাকা। ফেরৎ দিতে না পারলে আমার জেল হয়ে যাবে। হারামজাদী মাগীর পেটে পেটে এত শয়তানী? আমার সর্ব্বনাশ করে—

[হঠাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় রমণী। সকালে সে স্নান করেছে। একটা ডুরে শাড়ী পরেছে। একরাশ কালো চুল পিঠের ওপর এলানো। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। বড় পবিত্র, বড় মহিমময়ী মনে হচ্ছিল রমণীকে। শরৎ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

রমণী। সকালে উঠে গালাগালি দিচ্ছেন কেন?

শৈল। গালাগালি দেব না! আমার তিন হাজার টাকা চুরি করে তুমি পার পেয়ে যাবে?

রমণী। কি বললেন? আমি আপনার টাকা চুরি করেছি? আশ্চর্য আপনারা! আপনারা না ভদ্রলোক! কাল রাত্রে বেহুঁস হ'য়ে ঘরের মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। শেষরাত্রে কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আলো জ্বেলে দেখি আপনি বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। আপনাকে টেনে বিছানায় তুলতে গিয়ে দেখি মেঝেতে একটা থলে পড়ে আছে। খুলে দেখি অনেকগুলো টাকা। কি করি?

চারিদিকে চোর ডাকাতের উৎপাত। একেই তো এ পাড়ায় আমরা বাস করি প্রাণটা হাতে নিয়ে। টাকার থলেটা বুকের মধ্যে রেখে সারারাত জেগে বসে রইলাম, পাছে চোরে নিয়ে যায়। ভোর হতে থলেটা দেরাজে রেখে তবে স্নান করতে গেছি।

[দ্রুত ভেতরে গিয়ে থলিটা এনে মেঝেয় ফেলে দেয়।]

এই নিন আপনার টাকার থলি। গুণে নিন সব ঠিক আছে কি না। আমাদের বিশ্বাস কি, আমরা তো বেশ্যা। পতিতা! বাবু, আপনাদের কাছে পাঁচটা টাকা পেলেই আমরা খুশী। তিন হাজার টাকা নিয়ে কি করবো বলুন ?

[দ্রুত বেরিয়ে যায় রমণী। স্তব্ধ হতবাক দুটি প্রাণীকে নিয়ে মঞ্চ ঘুরতে থাকে। মঞ্চ ঘুরে আসে আগের কক্ষে। দেখা যায় উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন কুমার বাহাদুর। তাঁর পাশে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে শরৎ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কুমার বাহাদুর শরতের পিঠে হাত রাখলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন।]

কুমার। তারপর ?

শরৎ। পাঁকে ফুটেছিল এই পদ্ম, কিন্তু তার গন্ধ কি আপনি পাননি হুজুর ?

কুমার। পেয়েছি শরৎ। এত বেশী করে পেয়েছি যে আমি বিহ্বল হয়ে গেছি। কিন্তু সমাজ বলেন, মেয়েছেলের সবচেয়ে বড় অহংকার, তার সতীত্ব।

শরৎ। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—সতীত্বের চেয়েও বড় হুজুর। এই কথাটা আমি বহুবার বহুভাবে অনুভব করেছি। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের অত্যন্ত সতী নারীকেও আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল এমনকি মিথ্যা সাক্ষ্য পর্যন্ত দিতে দেখেছি। আবার এর ঠিক উল্টোটা দেখাও—

কুমার। তোমারি ভাগ্যে ঘটেছে শরৎ। শরৎ, তোমার মত পরিষ্কার চোখ ভগবান আমাকে কেন দেয়নি বলতে পারো ?

শরৎ। আর আমাকে লজ্জা দেবেন না হুজুর। আমি অত্যন্ত মূর্খ। আপনার সামনেও জ্ঞানের কথা বলে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করুন হুজুর।

কুমার। আরে না, না। এইটুকু বয়সে তুমি অনেক জেনেছো।

[এমন সময়ে অন্দর থেকে কুমার সাহেবের কর্মচারীর কণ্ঠ ভেসে আসে।—"হুজুর, রাত বাড়ছে। যদি শিকার করবার মত থাকে তবে রেডি হয়ে নিতে হোবে। জঙ্গল তো এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে।"]

কুমার। শিকার করবার জন্যেই তো এসেছি সরদার। তোমরা তৈরী হও। আমি যাচ্ছি। শরৎ, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি শিকারের তোড়জোড় করি।

[একটু এগিয়ে আবার ফিরে আসে।]

তুমিও যাবে আমার সঙ্গে ?

শরৎ। নিশ্চই যাবো কুমার বাহাদুর। আপনি পাকা শিকারী। জঙ্গলে আপনার তামাক সেজে দিয়েও আনন্দ পাওয়া যায়।

[হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান কুমার বাহাদুর। শরৎ ওঁর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হেসে ওঠে তারপর দরজার দিকে এগোয়। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রবেশ করে রমণী। বাইরে ততক্ষণে শিকারের তোড়জোড় ও ব্যস্ততার আভাস পাওয়া যায়।]

রমণী। এই যে তোমাকে একলা পেয়েছি।

শরৎ। কি ব্যাপার রে ?

রমণী। তুমি এখানে এসেছো কেন ?

শরৎ। বাঃ। আমার পুরোনো মনিব ডেকে পাঠিয়েছেন।

রমণী। তাই বলে তুমি মোসাহেবী করতে আসবে? তুমি কি মোসাহেব ?

শরৎ। তার আগে আমি যদি তোকে জিজ্ঞাসা করি তুই এখানে এসেছিস কেন ?

রমণী। পেটের দায়ে।

শরৎ। ঝি গিরি করে পেট ভরে না ?

রমণী। না ঝি গিরি করে পেটও ভরে না ইজ্জতও যায়।

শরৎ। তাই তুই নতুন করে আবার নাচনেওয়ালী সেজে পেটও ভরাচ্ছিস,—ইজ্জতও বাড়িয়ে নিয়েছিস ?

রমণী। ইজ্জৎ আমার কোনদিনই ছিল না। বার বছর বয়সে যখন বিধবা হয়েছিলাম, তখন ইজ্জৎ কি জিনিষ জানতাম

না। তারপর গ্রামের মাতব্বরেরাই আমার মাকে এক ঘরে করবার ভয় দেখিয়ে, আমার ইজ্জৎ লুঠ করে নিয়ে, বুঝিয়ে দিল, মেয়েদের ইজ্জতের কত দাম। তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে যখন হাওড়ার ঘোলাডাঙ্গায় এসে বাসা বাঁধলাম,—

শরৎ। তখন তুইই আমাকে থাপ্পড় মেরে শিখিয়ে দিয়েছিলি ইচ্ছে করে সহজে মেয়েরা ইজ্জৎ দেয় না। তাদের ইজ্জৎ জোর করে কেড়ে নিই, আমরা পুরুষরা।

রমণী। এ কথা বোল না দাদাঠাকুর, তা হলে আমার পাপ হবে। ভগবান কোথায় থাকেন জানিনা, কিন্তু তিনি যদি তোমার মত চোখ নিয়ে এই হতভাগিনী বেশ্যাগুলোর দিকে তাকাতেন, তাহলে—

শরৎ। চুপ কর, চুপ, কর মুখপুড়ি। অমন কথা বলিস না।

রমণী। কেন বলবো না? বেশ্যাবাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কে আমার বিয়ে দিয়েছিল জয়ন্তর সঙ্গে? কে আমায় ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল? আমি যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি সেইজন্য? কে আমায় পাপের পথ থেকে সরিয়ে রাখবার জন্য আমার বেকার স্বামীর হাতে মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেতো? সে কি ভগবান না তুমি?

শরৎ। তা হলে তুই আবার এ পথে এলি কেন মুখপুড়ি। জয়ন্ত কোথায়?

[রমণীর চোখে জল আসে]

রমণী। জয়ন্ত! যতদিন তুমি টাকা দিতে, ততদিন সে আমায় আদর করতো। তারপর তুমি কোথায় চলে গেলে। তখন সে তার বন্ধুদের ডেকে এনে, আমাকে তাদের কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে টাকা রোজগার করতো। আমি কাঁদতাম, পায়ে ধরতাম, মরে যাবার ভয় দেখাতাম। সে আমাকে লাথি মারতো। আমারি চোখের সামনে বাড়ীতে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ফুর্তি করতো। তুমি তখন কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় পালিয়েছিলে দাদাঠাকুর? তাইতো আমি আবার পালিয়ে এলাম—

[হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ওঠে রমণী, কেঁদে ফেলে শরৎচন্দ্রও।]

শরৎ। কি করবো বল? আমাকে যে তাড়িয়ে দিল।

রমণী। কে? কে তোমাকে তাড়িয়ে দিল দাদাঠাকুর?

শরৎ। তোরই মত একটা মেয়ে। তোরই মত অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল সে। একটা ছোট্ট চিঠিতে সে কি লিখেছিল জানিস?

রমণী। কি লিখেছিল দাদা?

শরৎ। লিখেছিল, আপনি এ দেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যান। আর এখানে আসবেন না। দোহাই আপনার। আমাকে এ ভাবে নষ্ট করবেন না। তাই তো আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম বোন।

৭

রমণী। দাদা!

[উচ্ছসিত ক্রন্দনে আবিষ্ট হয়ে শরতের বুকে মাথা রাখে রমণী। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করেন কুমার বাহাদুর। পরণে শিকারের পোষাক। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন—]

কুমার। শরৎ!

[দ্রুত রমণী শরৎকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। শরৎ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে জল এ মুখে অনাবিল হাসি।]

শরৎ, তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এত বড় সাহস তোমার? আমার তাঁবুতে বসে আমারই বাইজীর গায়ে তুমি হাত দাও। তুমি জানো, শিকারের জন্য আমি রাইফেল রেডী করে রেখেছি।

[শরৎ কোন উত্তর দেয় না, রমণী সর্পিনীর মত গর্জে ওঠে।]

রমণী। কুমার বাহাদুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। আপনার নেশা বেশী হয়ে গেছে।

কুমার। তুমি ভুলে গেছ বাইজী, একটু আগেই শরৎ বলেছিল,— হুজুরের নেশা, হুজুরের মতই বনেদী। চালে কখনো ভুল হয় না।

[স্তব্ধ শরৎ চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কুমার বাহাদুর তাকে বুকের কাছে টেনে নেন। হাসতে হাসতে কথা বলেন।]

শরৎ, তুমি কবিতার ব্যবসা কর। আর আমি টাকা দিয়ে জ্যান্ত কবিতা কিনি। একটু আগে তোমাদের দুটি ভাই-বোনের চোখের জলে ভেসে যাওয়া কবিতাটা আমার খু—উ—ব ভালো লেগেছে।

[হাসতে হাসতে আর এক হাত দিয়ে রমণীকে তার বিশাল বক্ষের মধ্যে টেনে নেন কুমার বাহাদুর। আনন্দে পাগল হয়ে অতি দ্রুতে বাজতে থাকে নূপুর তবলা আর সারেঙ্গী।]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীর বাইরের ঘর। ১৯২১ সালের কোন একটি সন্ধ্যা। ঘরের পিছনের দিকে মাঝখানে শরৎচন্দ্রের লেখার টেবিল। পাশে বুক সেলফে অনেক বই। টেবিলে আট দশটা ফাউন্টেন পেন ছড়ানো। লেখার কাগজ ও ফাইল। দু একটা পাণ্ডুলিপির কপি। ঘরে উপস্থিত আছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, "ভারতী"র পরিচালক সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, 'আগমণী'র সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, "পল্লীশ্রী"র সম্পাদক অক্ষয় কুমার সরকার, 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী ও পরিচালক রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রমাপ্রসাদ বাবু টেবিলে পিছন ফিরে বসে একটা পাণ্ডুলিপির ফাইল পড়ছেন। বাকী সকলে পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন। বক্তা অনেক, শ্রোতা কম।]

কুমুদ। তাই বলে একবার ছাপানো গল্প আবার আপনি আপনার কাগজে ছাপলেন ?

অক্ষয়। তা আমি কি করবো। নতুন গল্প দিলেন না। আমি ওই 'মহেশ'ই ছাপলাম।

কুমুদ। কাগজের ইজ্জৎ আপনারা আর কিছু রাখলেন না মশাই।

অক্ষয়। দেখুন, আমার ওপর চোখ গরম করবেন না। যার লেখা, তাকে বলবেন।

হরিদাস। আঃ ! কি হোল আপনাদের ? চেঁচামেচি করছেন কেন ?

কুমুদ। আরে মশাই, ওই মহেশ গল্পটা—একবার আমাদের বঙ্গবাণীতে ছাপা হয়ে গেছে,—আমাদের অক্ষয় বাবু, তার পাড়ার কাগজ 'পল্লীশ্রী' না কি, তাতে আবার ছেপে বসে আছেন।

হরিদাস। তাতে হয়েছে কি ? ভালো জিনিস যতবার পাতে দেওয়া যায়, ততই পাঠকদের রসের আস্বাদন ঘটে।

কুমুদ। আপনি থামুন মশাই। আপনি ঝানু লোক। যা কিছু ভালো গল্প উপন্যাস তো আপনার 'ভারতবর্ষে' ছেপে বসে আছেন।

সৌরিন্দ্র। কেন ছাপবেন না, বলুন ? ওর নাম হরিদাস চাটুজ্জ্যে। অনেক টাকা। টাকা দিয়ে কিনে রেখে দিয়েছেন লেখকদের। এই কলকাতায় বসে, সুদূর রেঙ্গুনে পর্যন্ত ঘুষ পাঠিয়ে পাঠিয়ে শরৎ চাটুজ্জ্যেকে একেবারে বাঁধা লেখক করে রেখে দিয়েছেন।

হরিদাস। এতে আপনার গায়ে লাগছে কেন সৌরিন বাবু ? শরৎদা তো আপনার বন্ধু লোক। কত ছোটবেলা থেকে আলাপ। ওই কিনে রাখার কাজটা আপনি করে ফেললেই পারতেন ?

সৌরিন্দ্র। যেহেতু আমি তার বন্ধু, সেইহেতু কিনে রাখার কাজটা আমি করতে পারি না। আমি যেটা পারি, সেইটাই করেছি। আমি একটা লেখকের জন্ম দিয়েছি।

[সকলে হেসে ওঠে।]

সুরেশ। কি রকম, কি রকম? লেখককে জন্ম দেওয়ার ব্যাপারটা আবার কি রকম? শরৎচন্দ্রের বাপ মা তা হলে—

সৌরিন্দ্র। তুমি চুপ করো বাবা সমাজপতি। নামটি তোমার সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি। কিন্তু কথাবার্তা তো দেখছি রীতিমত অসামাজিক।

[সকলে হেসে ওঠে।]

যেমন তুমি, তেমনি তোমার পত্রিকা। কি? না "আগমনী"। এখনো তো কোন লেখককে সাহিত্য জগতে আগমন করাতে পারলে না বাবা।

হরিদাস। আপনি তবু আপনার "ভারতী"র গর্ভে, একজন লেখকের জন্ম দিয়েছেন।

[আবার সকলে হেসে ওঠে। ভীষণ রেগে যান সৌরিন্দ্র। টেবিল চাপড়ে বলতে থাকেন।]

সৌরিন্দ্র। নিশ্চয়ই দিয়েছি। কে চিনতো শরৎ চাটুজ্জ্যেকে? ছোটবেলার লেখাগুলো হেলায় ফেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এর ওর কাছে ফেলে রেখে, শরৎ চলে গেল বার্মায়। ভারতী পত্রিকায় যখন ওর "বড়দিদি" ছাপতে সুরু করলাম, প্রথম দুটো সংখ্যায় লেখকের নাম পর্যন্ত দিইনি। সবাই ভাবলে নিশ্চয়ই ওটা রবিঠাকুরের লেখা। তা না হলে অত ভালো লিখবে কে? তারপর তৃতীয় সংখ্যায় যখন নাম বেরোল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তখন স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ একদিন আমায় ডেকে বললেন,—"সৌরিন, এই লেখককে হারিয়ে যেতে দিও না। ওকে ধরে নিয়ে এসে লেখাও। না হলে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।" এত বড় লেখক শরৎচন্দ্রকে দেশ পেতো কোথায়, আমি যদি সে দিন—

সকলে। ঠিক ঠিক। একথা একশবার সত্যি।

সৌরিন্দ্র। তখন কোথায় ছিল হরিদাস চাটুজ্জ্যের "ভারতবর্ষ" ?

হরিদাস। ভুলে যাবেন না সৌরিন বাবু। আপনার "ভারতী"তে "বড়দিদি" বেরোবার পরে, শরৎচন্দ্রকে আবার লোকে ভুলে গিয়েছিল। "ভারতবর্ষ" পত্রিকা শরৎদাকে আবার মানুষের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

অক্ষয়। যাক্! তাহলে আর ঝগড়ার দরকার নেই। প্রমাণ হয়ে গেল "ভারতী" শরৎবাবুর জন্মদায়িনী এবং "ভারতবর্ষ" শরৎবাবুর পালন কর্তা।

কুমুদ। Correct! এর চেয়ে খাঁটি কথা আর হয় না।

সুরেশ। কিন্তু কুমুদ, তা না হয় হোল। শরৎবাবুর তো পাত্তা নেই। আর কতক্ষণ বসবো ?

সৌরিন্দ্র। ওই শরতের দোষ। লেখে ভালো। কিন্তু এমন কুঁড়ে, কাউকে লেখা দেবার নামটি করে না।

কুমুদ। সে দিক দিয়ে "ভারতবর্ষ" ভাগ্যবান। অনেক বই ছাপলে। তা—পরপর ধর না কেন,—বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, দেবদাস, শ্রীকান্ত, নিষ্কৃতি, স্বামী, দত্তা, গৃহদাহ—

[হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রবেশ করে ভোলা। সকলে চুপ হয়ে যায়। ভোলা ঘুরে ঘুরে সকলকে দেখে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।]

সকলে। আরে ও ভোলা।

[ভোলা থামে।]

সুরেশ। তোমার বাবু কখন আসবেন ?

ভোলা। ঠিক নেই।

কুমুদ। কোথায় গেছেন ?

ভোলা। ঠিক নেই।

অক্ষয়। কখন গেছেন ?

ভোলা। ঠিক নেই।

হরিদাস। তোমার মাথার ঠিক আছে তো ?

ভোলা। ঠিক নে—। না, ঠিক আছে।

হরিদাস। যাক্ ঠিক আছে তাহলে ?

ভোলা। ঠিক আছে।

হরিদাস। এইবার বলো।

ভোলা। দুপুর বেলায় বাবু চোখ বুজে গড়গড়া খাচ্ছিলেন। এমন সময়—

[হঠাৎ ঢুকে পড়ে শরৎ। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। হাতে ছড়ি, চাদর ধুতি পরণে, চোখে রীমলেশ চশমা।]

শরৎ। নলিনী সরকার এসে হাজির।

ভোলা। তারপর—

শরৎ। তারপর আমি এসে গেছি। তুই হারামজাদা এখনও বলে যাবি? যা ভেতরে যা, বাবুদের চা দিয়েছিস?

[ভোলা ঘাড় নাড়ে অর্থাৎ "না"]

তোর মায়ের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?

ভোলা। মায়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। মা তো চা দিতে বললেন।

শরৎ। তুমি দাওনি? (ভোলা আবার ঘাড় নাড়ে—অর্থাৎ "না") বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। (ভোলা এগোয়) তামাক দিয়ে যা।

[ভোলা ঘাড় নেড়ে চলে যায়। শরৎ চেয়ারে বসে, আফিং এর গুলি মুখে দেয়।]

শরৎ। বাঃ! এ যে দেখছি, বিক্রমাদিত্যের রাজসভা আলো করে বসে আছেন সব রথীমহারথীর দল।

হরি। অনেক্ষণ বসে আছি শরৎদা। আপনার পাত্তা নেই। কোথায় গিয়েছিলেন?

শরৎ। ওই যে বললাম,—নলিনী সরকার।

হরি। কোন নলিনী?

শরৎ। আরে "বিজলী" পত্রিকার নলিনী সরকার রে বাবা। ছোঁড়া হাড়-বজ্জাৎ। আমার বারটা একেবারে বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

সৌরিন্দ্র। কী ব্যাপার বলতো?

শরৎ। ও একটা লেখা চেয়েছিল ওর "বিজলীর" জন্য। ছোঁড়াকে দু-বছর ঘুরিয়েছি, কিন্তু লেখা দিতে পারিনি। আজ

সকাল থেকে এসে বাড়িতে ধর্না দিয়েছিল। বললো পত্রিকায় চাকরী করে পেট ভরে না। আপনাদের এখানে রামকেষ্টপুরে একটা টিউশনীর খবর আছে। আপনি একটু সুপারিশ করে দিলে—চাকরীটা হয়। আমি বললাম এ আর কী এমন শক্ত কাজ—চলো। খাওয়া দাওয়া করে ওর সঙ্গে বেরোলাম। ছোঁড়া রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি করলে। আমি বলি—ও নলিনী এইটুকু রাস্তা যাবে—আবার ট্যাক্সি কেন? রিক্সা কর না। ও বললে—না দাদা, তা কথনো হয়, আপনার একটা সম্মান আছে না', ট্যাক্সি তো চললো—আমি চোখবুজে বসে সুপারিশের ভাষা ঠিক করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি গুম্ গুম্ শব্দ হচ্ছে। তাকিয়ে দেখি গাড়ীটা হাওড়া ব্রীজ পার হচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—ও নলিনী। এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—এ যে কলকাতায় এসে গেলাম। ছোঁড়া বললে—আপনি চুপ করে বসুন না দাদা। আপনি কি জলে পড়েছেন? বুকের ভেতরটা গুর গুর করতে লাগল। ছোঁড়া নিশ্চয়ই আমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে। দুর্গানাম জপ করতে করতে একটা বাড়ীর সামনে গাড়ীটা দাঁড়ালো। নলিনী বললে—নেমে আসুন। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। সুড় সুড় করে নেমে নলিনীর পিছনে পিছনে চললাম। দোতলার একটা ঘরে ঢুকে নলিনী আমার সামনে একটা খাতা আর একটা কলম রেখে

বেরিয়ে গেল। ছোঁড়া করলে কি জান? দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—ওরে ও নলিনী! একি বাবা! আমাকে ঘরে বন্ধ করে চললি কোথায়? ছোঁড়া বলে কি জান? বলে 'বিজলী' পত্রিকার জন্য লেখাটা শেষ করে তারপর বাড়ী যাবেন। যতক্ষণ লেখা শেষ না হবে ততক্ষণ দরজা খুলবো না। আমি চেঁচামেচি গালাগালি করতে লাগলাম। কিছুতেই দরজা খুললো না।

হরি। খুব মজা তো—তারপর?

শরৎ। খুব মজা লাগছে—না?

হরি। লাগবে না? দু'টো বছর লোকটা আপনার পিছনে ঘুরছে —একটা লেখার জন্য।

সৌরিন্দ্র। তারপর কি করলে?

শরৎ। কি আবার করবো—দু'টো ঘণ্টা ঘরের মধ্যে আটকে থেকে ছোঁড়ার পত্রিকার জন্য একটা লেখা শেষ করে তারপর ছাড়া পেলাম।

[সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।]

অক্ষয়। তা'হলে আমাদেরও কি ওই রকম করতে হবে নাকি?

শরৎ। অত সস্তা নয়। আমার ডাক নাম জানো? ন্যাড়া। ন্যাড়া একবার বেলতলায় যায়। আর তোমাদের সঙ্গে বাইরে বার হই।

কুমুদ। রমাপ্রসাদবাবু নিজে এসেছেন—আজ আর লেখা না নিয়ে যাবেন না।

শরৎ। ও রমাপ্রসাদই আসুক আর শ্যামাপ্রসাদই আসুক, লেখা নেই।

সুরেশ। আমারটা ?

শরৎ। হবে না।

অক্ষয়। আমার ?

শরৎ। হবে না।

[রমাপ্রসাদ এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। টেবিলে রাখা পাণ্ডুলিপিটা একমনে পড়ছিল। সে হঠাৎ বলে উঠলো—]

রমা। এই তো লেখা রয়েছে। এই আমি নিয়ে যাচ্ছি।

[শরৎ তাড়াতাড়ি লেখাটা কেড়ে নেয়।]

শরৎ। আরে না না, ও সব লেখা ছাপতে হবে না।

রমা। কেন ? ছাপতে হবে না কেন ?

শরৎ। ওর নাম "পথের দাবী"।

রমা। পথের দাবীই হোক আর ঘরের দাবীই হোক, আমি ছাপবো।

শরৎ। তোমার "বঙ্গবাণী" তা'হলে উঠে যাবে।

রমা। যাক্‌গে।

শরৎ। তোমার জেল হয়ে যাবে।

রমা। যাক্‌গে।

শরৎ। আরে! এও যে নলিনীর মতো জোর করতে আরম্ভ করলো।

রমা। আমি কিছুতেই শুনবো না দাদা। এতক্ষণ ধরে লেখাটা পড়ছিলাম। এই লেখা ছেপে বেরুলে বাংলাদেশে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

[ঝপ করে টেবিল থেকে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় রমাপ্রসাদ।]

রমা। চলুন কুমুদ বাবু, আমার কাজ হয়ে গেছে।

[হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় রমাপ্রসাদ]

শরৎ। আরে শোন্ শোন্। ও রমাপ্রসাদ—যা লেখাটা নিয়ে চলে গেল—

[সকলে হাসতে থাকে।]

অক্ষয়। বেশ করেছে। ওইভাবে না নিলে তো আপনার লেখা পাওয়া যাবে না।

শরৎ। কি করে পাওয়া যাবে বলুন। দিনের পর দিন চেষ্টা করে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে—কিন্তু এক কলম লেখা বেরুচ্ছে না।

[প্রবেশ করে ভোলা।]

ভোলা। মা ডাকছেন।

শরৎ। বল্‌গে লেখাটেখা নেই।

ভোলা। মা আপনার লেখা দিয়ে কি করবেন?

শরৎ। ও! বড় বৌ ডাকছে? বল যাচ্ছি।

হরি। তা হলে আজ আমরা চলি।

[সকলে উঠে দরজার দিকে এগোয়]

শরৎ। হরিদাস,—তুমি কাল একবার আসতে পারবে?

হরি। ঠিক আছে।

শরৎ। একী সৌরিন? তুমিও চললে যে।

সৌরিন্দ্র। রাত্তির হচ্ছে না?

শরৎ। হোক রাত্তির। তুমি বোস একটু।

[সৌরিন্দ্র বসে, সকলে চলে যায়। প্রবেশ করে মোক্ষদা। ঢুকেই একগলা ঘোমটা দিয়ে আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে]

একী! তুমি চলে যাচ্ছ কেন? ও তো সৌরিন! কী মুশকিল। সৌরিনকে দেখেও তুমি ঘোমটা দিতে শুরু করলে বড় বৌ।

[ঘোমটা ফেলে দিয়ে হেসে ভিতরে ঢোকে মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। কি করবো বলো? দিনরাত্তির ভিড় আর ভিড়। এ যেন রোজই আমাদের শ্যামচাঁদপুরের হাট বসে। ঘরের মধ্যে বসে বসে হাঁপিয়ে মরি, ঘরের মানুষটা ঘরে থেকেও যেন সব সময় বাইরে।

সৌরিন্দ্র। তা শরৎচন্দ্রের মতো আন্তর্জাতিক পুরুষের বৌ হয়েও, অন্তঃপুরিকা হয়ে থাকলে চলবে কেন?

শরৎ। বলতো, বলতো সৌরিন। আজকালকার মেয়েগুলোকে দেখি আর আমার হিংসে হয়। তারা কত আধুনিক। সভায় সমিতিতে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে।

মোক্ষদা। আহা মরে যাই। তোমার সঙ্গে লোকের মধ্যে যাবো। তাদের একটা কথাও বুঝতে পারবো না—তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না—

সৌরিন্দ্র। কেন? শরৎ কি আপনাকে লোকের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছে?

মোক্ষদা। বারণ করবে কেন? আমি কি লেখাপড়া জানি যে তাদের সঙ্গে গল্প করবো?

শরৎ। না সৌরিন, একটু একটু জানে। শুধু চন্দবিন্দুটা উল্টো করে লেখে।

. [সবাই হেসে ওঠে, মোক্ষদা রেগে যায়।]

মোক্ষদা। কিরে ভোলা। তুইও যে হাসছিস? বাবুর আস্কারা পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গেছিস না? ভগবান আমায় মুখ্যু করে রেখেছে, তার আমি কি করবো। আমার স্বামীর লেখা পড়ে সকলে পাগল। কত নাম-ডাক, কত মান-সম্মান, আর এমনই আমার পোড়া-কপাল যে একটা গল্পও আমি পড়ে দেখতে পারলুম না।

শরৎ। কোন দরকার নেই বড় বৌ, তুমি বই পড়ে সময় নষ্ট না করে মনের আনন্দে রান্না করে যাও।

মোক্ষদা। ওই গো মনে পড়েছে। আজ তোমার জন্য পায়েস করেছিলাম দিতে ভুলে গেছি। দাঁড়াও নিয়ে আসি। সৌরিন ঠাকুরপো চলে যাবেন না যেন। আয় ভোলা আয়।

শরৎ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি এখন খেতে পারবো না। নলিনী এত খাইয়ে দিয়েছে যে—

মোক্ষদা। কেন তুমি খেলে ? তোমায় আমি কতদিন বলেছি বাড়ীর বাইরে কিছু খাবে না। বৌ-এর রান্না খেয়ে খেয়ে পুরোনো হয়ে গেছে তো, এখন আর ভাল লাগছে না। বাইরের মেয়েছেলের রান্না বড় মিষ্টি লাগে না ?

শরৎ। কী মুশকিল ? আমি কি করবো ? তারা যদি জোর করে খাইয়ে দেয় ?

মোক্ষদা। আহা! কি কথাই বললে ? জোর করে খাইয়ে দেয়। খাইয়ে দিলেই বা খাবে কেন ? ঘরে তোমার বিয়ে করা বৌ রয়েছে না ? সে গতর পুড়িয়ে রান্না করছে না ? শীত নেই গ্রীষ্মি নেই, রাত্তির বারটা অবধি ভাতের থালা কোলে করে বসে থাকে কে ? আমি ? না তোমার ঐ—

শরৎ। আহা, তুমি মিছিমিছি রাগ করছো কেন ? তোমারও তো শরীর খারাপ। দিনরাত্তির তো সর্দ্দিতে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছো। রান্নার জন্যে লোক রেখে দিলুম। তাকে .দিলে তাড়িয়ে, কী ? না নিজে হাতে রান্না করে স্বোয়ামীকে খাওয়াবো। এদিকে ডাক্তার বদ্যিতে কত পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে।

সৌরিন্দ্র। কী মুশকিল, তোমরা যে ঝগড়া শুরু করলে।

শরৎ। তুমি জান না সৌরিন। এই খাওয়া খাওয়া নিয়ে আমায় দিন রাত্তির জ্বালিয়ে মারছে। একে তো আমি এদেশের

বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিষ মুখে দিতে চাইনে। কিন্তু বাড়ীর মানুষটা এ কথা বোঝে না।

মোক্ষদা। না বোঝে না। তুমি একলাই বোঝ। আড়বুঝো ব্যাটাছেলে কোথাকার। না খেয়ে খেয়ে কি হাল হয়েছে দেহটার, সেদিকে হুঁস আছে। এত লোকের মরণ হয়, আমার বেলায় মুখপোড়া যম, চোখ বুঁঝে আছে। ঠিক আছে—যে দিকে দু চোখ যায় আমি চলে যাবো।

শরৎ। তাই যাও। আমিও বেঁচে যাই। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সে সেইখানে, যেখানে দু'বেলা খাবার জন্য জবরদস্তি সহ্য করতে হয় না।

মোক্ষদা। কী? এত বড় কথা বললে? ঠিক আছে। আয়তো ভোলা।

[ভোলার হাত ধরে টানতে টানতে প্রস্থান করে মোক্ষদা। হতভম্ব শরৎ ও সৌরিন্দ্র তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দরজার দিকে এগোয় সৌরিন্দ্র]

সৌরিন্দ্র। তা হলে—

[সৌরিন্দ্রের হাত ধরে শরৎ।]

শরৎ। আরে দাঁড়াও। শুনলে না বড় বৌ পায়েস রান্না করেছে?

সৌরিন্দ্র। কিন্তু বৌঠান যা রেগে আছেন, এখন পায়েসের আশা কম।

[কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে মোক্ষদা। মুখে হাসি। হাতে দু'বাটী পায়েস।]

মোক্ষদা। আমার কথাগুলো তেতো হলেও, হাতের রান্নাটা মিষ্টি, একথা আপনার বন্ধুও বলেন ঠাকুরপো। আর রাগ যদি করে থাকি, তবে সে এমন মানুষের উপর করেছি যার গায়ের চামড়া গণ্ডারের মতন—কান দুটো খোলে ভর্তি, আর চোখে পড়েছে ছানি।

[সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। মোক্ষদা পায়েসের বাটী দু'টো দু'জনের হাতে তুলে দেয়। হাসতে হাসতে প্রবেশ করে দিলীপ কুমার রায়। যুবক, সৌম্য চেহারা।]

দিলীপ। আমি যেন বাদ পড়ে না যাই বৌদি।

[শরৎ তাড়াতাড়ি বাটীগুলো লুকিয়ে ফেলে পিছন দিকে।]

শরৎ। লুকিয়ে ফেল, লুকিয়ে ফেল সৌরিন। ক্ষুদে রাক্ষস এসে গেছে। তোমারটা খাবে, আমারটা খাবে, আবার রান্না ঘরের হাঁকে যদি কিছু থাকে তাও চেটে পুটে শেষ করবে।

[সকলে হাসতে থাকে।]

দিলীপ। দেখছো—দেখছো বৌদি, দাদার অবিচারটা।

মোক্ষদা। আহা! কেন ছেলেটাকে অমন করে বলছো গো? তুমি এসো মণ্ট আমার সঙ্গে।

শরৎ। মোটেই না, যা দেবার আমাদের সামনে দাও। এই ছোঁড়া, চুপ করে বোস। জানো সৌরিন—আর একটা ক্ষুদে রাক্ষসের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। সে অনেকদিন আগেকার কথা।

সৌরিন্দ্র। কে বলতো ?

শরৎ। তুমিই বলো না ? তুমিও তো চিনতে তাকে।

সৌরিন্দ্র। রাজু ? রাজুর কথা বলছো শরৎ ?

শরৎ। হ্যাঁ সৌরিন—রাজু—আমার রাজু।

দিলীপ। রাজু কে দাদা ?

শরৎ। তোমাদের শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ গো।

দিলীপ। এ্যাঁ! ইন্দ্রনাথ! উঃ কী সৌভাগ্য আমার। আপনার শ্রীকান্ত পড়ার পর থেকে ঐ ইন্দ্রনাথকে যে কী ভাল লেগেছে। বলুন না দাদা আপনার ইন্দ্রনাথের গল্পটা —একবার বলুন না।

[শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে যায়।]

শরৎ। ইন্দ্রনাথের গল্পত একরাত্রে শেষ করা যাবে না ভাই। রাজু যে আমার কে ছিল, কতখানি ছিল, আজও রাজুর কথা মনে পড়লে মনটা আকুলি বিকুলি করে ওঠে।

[বাটী হাতে প্রবেশ করে মোক্ষদা। মন্টুকে দেয়।]

মোক্ষদা। বলো না গো—তোমার ঐ রাজুর গল্পটা। আমি অনেকবার শুনেছি। আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।

[হঠাৎ পরিবেশ যেন কিরকম থমথমে হয়ে যায়। সবাই শরৎ এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শরৎ-এর দৃষ্টি বহুদূরে প্রসারিত।]

শরৎ। ভাগলপুরে মামাদের বাড়ীর কাছে একজন নামকরা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন—রামরতন মজুমদার। রামরতনবাবুর এক ছেলের নাম রাজেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অমন বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে—রাজেনের মতন আর কাউকে দেখলাম না। [একটু থেমে] রাজুদের বাড়ীর কাছেই ছিল গঙ্গা। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজু বেড়াতে বেরিয়েছে। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা, রাস্তা প্রায় নিস্তব্ধ। বারারী ষ্টেটের ইস্কুলের হেডপণ্ডিত....

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ওঠে। সহিসের হাট্ হাট্ শব্দ। একজন মাতাল সাহেবের কণ্ঠ শোনা যায়—"ইউ বাবু—হাট যাও—রাস্তা ছোড়—আঃ ফির কিঁউ ইধার আয়ে—ইউ ব্ল্যাডি নেটিভ"। একটি পুরুষ কণ্ঠের আর্ত চীৎকার ওঠে—"আঃ-আঃ মরে গেলুম গো—কে কোথায় আছো বাঁচাও গো।" সাহেবের উচ্চ হাসি এবং ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমে বিলীন হয়ে যায়। মঞ্চ ঘুরে আসে গঙ্গার অদূরে একটি বনপথে। রাজু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। স্বাস্থ্যবান যুবক। সামনে কাকে দেখে হাঁক দেয়—]

রাজু। ন্যাড়া—এই ন্যাড়া—ন্যাড়া শোন এদিকে।

[শরৎ ঢোকে]

কোথায় যাচ্ছিস ?

শরৎ। জমিদার বাড়ী যাত্রা শুনতে। তুই যাবি না

রাজু। না। তোরও যাওয়া হবে না।

শরৎ। কি হয়েছে রে ?

রাজু। পুলিশ সাহেব পণ্ডিত মশাইকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছে।

শরৎ। সে কী রে? কেন?

রাজু। কেন আবার মদ খেয়ে গরম বেড়েছে। আজ শালাকে এমন শিক্ষা দেব—

শরৎ। তুই মারবি পুলিশ সাহেবকে?

রাজু। ছাখনা কি করি?

শরৎ। সাহবের কাছে পিস্তল আছে। আমাদের কিন্তু খালি হাত।

রাজু। ভয়ে ইঁদুরের গর্তে ঢুকগে যা, বাঁদর কোথাকার। তোকে যা বলছি তুই তাই কর।

শরৎ। বল

রাজু। গঙ্গায় অনেক নৌকো আছে। কিছু দড়ি যোগাড় করে নিয়ে আয়।

শরৎ। ওদের দড়ি তো ছোট ছোট।

রাজু। জোড়া দিলে বড় হয়ে যাবে। তিন চারখানা নিয়ে আয়।

[শরৎ ছুটে চলে যায়, রাজু জায়গাটা পরীক্ষা করতে থাকে। রাত বাড়ছে, শেয়াল কুকুরের ডাক শুরু হয়। শরৎ দড়ি নিয়ে আসে। সে হাঁপাচ্ছে।]

রাজু। হাঁপাচ্ছিস কেন? তোকে কি কেউ তাড়া করেছে?

শরৎ। না—মাঝিরা বুঝতে পারেনি। ছুটে এসেছি তাই।

রাজু। শোন—তুই দড়িগুলো জোড়া লাগিয়ে বড় কর। তারপর রাস্তার দু'ধারের গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলি আয়।

শরৎ। কি করবি বলতো ?

রাজু। সাহেব ব্যাটা বিলিয়ার্ড খেলে এক্ষুনি ফিরবে। মদ খেয়ে ব্যাটা তো টং হয়ে থাকবে। ঘোড়া ছুটিয়ে বাছাধন এই দড়িতে লেগে ঘোড়া শুদ্ধু চীৎপটাং হবে। তারপর—

[হি হি করে হেসে ওঠে রাজু। হাসতে থাকে শরৎচন্দ্রও। দু'জনে দুদিকের গাছে দড়িটা বেঁধে ফেলে।]

এই ন্যাড়া। দড়িটা একটু টান করনা।

[দড়ি বাঁধা শেষ হলে শরৎ রাজুর পাশে এসে দাঁড়ায়।]

বেঁধেছিস ?

শরৎ। হ্যাঁ।

রাজু। আয় এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সাহেব ব্যাটা একটু পরেই ফিরবে।

শরৎ। তোর কিন্তু খুব সাহস রাজু।

রাজু। তোর নেই ?

শরৎ। আছে, তবে তোর মতন নয়।

রাজু। হ্যাঁরে ন্যাড়া। তোর সেই গঙ্গাযাত্রী বুড়োটার কথা মনে আছে ?

শরৎ। নেই আবার ! সেবার সেই তারাপদর ছেলেটা কলেরায় মারা গেল। তাকে পোড়াবার সময় তো ?

রাজু। হ্যাঁ। তুই কিন্তু সেবার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি।

শরৎ। ভয় পাবো না? দিনের বেলাতেও ওই শ্মশানে কেউ যেতে সাহস করে না—তবে তুই সঙ্গে ছিলি এই যা ভরসা।

রাজু। তোর মনে আছে সব কথা?

শরৎ। মরা ছেলেটাকে কাঁধ থেকে যখন নামালাম তখন তো মাঝ রাত্তির—কি অন্ধকার ছিল সেই রাতটা—

[সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়। দ্রুত কণ্ঠে শব্দ শোনা যায়—"বলহরি—হরিবোল"—একটা কাঁথা জড়ানো বাচ্ছা ছেলের মড়া বুকে করে বেরিয়ে আসে রাজু, পিছনে শরৎ। মড়াটা নামিয়ে রেখে গামছায় কপালের ঘাম মোছে রাজু। মঞ্চ এত অন্ধকার যে মানুষ চেনা যায় না।]

রাজু। একটা বিড়ি দেতো ন্যাড়া।

[শরৎ কোমরের খুট থেকে একটা বিড়ি বার করে দেয়। দুজনে বিড়ি ধরায়, হঠাৎ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কে যেন বলে ওঠে—]

কণ্ঠ। আমায় একটা বিড়ি দেবে?

[কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল। ভয়ে শরৎ-এর মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে। "ওরে বাপরে বাপ"—বলে পালাবার চেষ্টা করল শরৎ। রাজু তাকে চো ৎ ধরলো।]

রাজু। ভয় নেই দাঁড়া চুপ করে।

[শরৎ দাঁড়ালো। সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আর অস্ফুট স্বরে—'রাম-রাম' করছে।]

রাজু। কে ?

কণ্ঠ। আমি।

রাজু। আমি কে ?

[রাজু ফস্ করে দেশলাই জ্বাললো, দেখা গেল পাশেই কম্বল চাপা দিয়ে মানুষের মতো কে একটা শুয়ে আছে।]

আর একটা মড়ারে। কারা পোড়াতে এসে ফেলে রেখে চলে গেছে। মনে হয়,—

কণ্ঠ। না গো আমি মড়া নই।

[শরৎ রাজুর হাত চেপে ধরলো]

রাজু। তা'হলে কে তুমি ?

কণ্ঠ। আমি গঙ্গাযাত্রী।

[রাজু আর একটা দেশলাই জেলে কম্বলের একটা ধার তুলে ধরল। আশি বছরের এক হাড়জিরজিরে বুড়োর মাথা দেখা গেল।]

রাজু। এই ন্যাড়া, ভয় পাচ্ছিস কেন ? এ মড়া নয়, সত্যি সত্যিই গঙ্গাযাত্রী। তাড়াতাড়ি মাটি খোঁড়, ছেলেটাকে পুঁতে দেব।

[রাজু আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বুড়োর মুখে পুরে দিল, শরৎ মাটি খুঁড়তে লাগল। বুড়ো টান মেরে বললো—]

বুড়ো। আঃ বাঁচালে বাবা। ক'দিন হল এসেছি। চাইলে একটা বিড়িও দেয় না।

রাজু। ক'দিন এসেছো ?

বুড়ো। তিনদিন বাবা, মরণ আর হচ্ছে না।

রাজু। তোমার সঙ্গের লোকজন কোথায় ?

বুড়ো। যাত্রা শুনতে গেছে, আবার রাত্তিরে আসবে।

রাজু। তা তুমি মরছ না যখন, এখানে পড়ে রয়েছ কেন ?

বুড়ো। কি জানি বাবা, কি হবে আমার। একবার গঙ্গাযাত্রী হয়ে এসে আর নাকি ঘরে ফিরতে নেই।

রাজু। কে বললে ফিরতে নেই, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি এখন মরবে না। তোমার বাড়ী কোথায় ? চলো আমার সঙ্গে বাড়ী চলো, নাহলে ঐ তোমার লোকজন যারা তোমায় নিয়ে এসেছে, তারাই হয়ত তোমায় গলা টিপে মেরে ফেলবে।

[গোঁ গোঁ করে কেঁদে ওঠে বুড়ো]

বুড়ো। তুমি ঠিক বলেছো বাবা। আজ কদিন ধরে ওরা আমায় শাসাচ্ছে, আর একদিন দেখবো। যদি না মরে, গলা টিপে মেরে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো।

[কাঁদতে থাকে বুড়ো।]

রাজু। কেঁদো না—আমরা যখন এসে পড়েছি তোমার একটা ব্যবস্থা হবেই। এই হ্যাড়া গর্তটা হয়েছে ?

শরৎ। হয়ে গেছে।

রাজু। পুঁতে দে।

শরৎ। আচ্ছা তুইও আয় না।

[শরৎ কোদাল দিয়ে একধারে মাটি খুঁড়ছিল। এবার দুজনে বাচ্চাটা পুঁতে দিল। মুখে বলতে লাগল, 'বলহরি—হরিবোল'।]

রাজু। ব্যাস, এইবার ওই বুড়োর কাঁথা কম্বল নে। আমি ওকে কাঁধে করি।

[রাজু বুড়োকে কাঁধে তুলে নিল, বুড়ো আর একবার চেঁচিয়ে উঠল।]

বুড়ো। উ-হুঁ-হুঁ।

[রাজু এগিয়ে চললো। শরৎ তার পিছনে পিছনে কম্বল নিয়ে এগোল। মুখে ওদের—"বলহরি-হরিবোল"। আলো নিভল। ওদের হরিনামের শব্দ ছাপিয়ে ঘোড়ার খুরের এগিয়ে আসার শব্দ হতে লাগলো। সঙ্গে জড়িত কণ্ঠে ইংরাজী গান। মঞ্চে আলো জ্বললো। দেখ গেলো শরৎ ও রাজু মঞ্চে ছুটোছুটি করছে।]

রাজু। এই ন্যাড়া সাহেব আসছে, তাড়াতাড়ি ওদিকে যা, দড়িটা উঁচু করে ধর।

[ছুটে শরৎ এবং রাজু দুদিকে চলে গেল। ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমে খুব দ্রুত ও জোরে হতে লাগলো। সেই সঙ্গে মাতালের ইংরাজী গান। হঠাৎ বিকট চীৎকার করে সাহেব উল্টে পড়ে যাওয়ার শব্দ। সাহেবের আর্তনাদ ও ঘোড়ার চীৎকার—একসঙ্গে এক তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো। দেখা গেলো—গড়াতে গড়াতে একধার থেকে সাহেব মঞ্চে এসে পড়লো। হিংস্র বাঘের মতো রাজু তার ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়লো। তারপর প্রচণ্ড মারে সাহেবকে রক্তাক্ত করে ফেললো। সাহেব যন্ত্রণায় গোঙ্গাতে লাগলো। রাজু সাহেবের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে একবার সেইটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। তারপর রিভলভারটায় একটা চুমু খেলো। শরৎ তার পাশে দাঁড়িয়ে।]

রাজু। চল্।

শরৎ। পিস্তলটা কি করবি? ওটা থাকলে তো ধরা পড়ে যাব।

রাজু। দূর হাঁদা। গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যাবো।

[হাসতে থাকে রাজু। হাসতে থাকে শরৎ।]

শালা সাহেব আজ খুব শিক্ষা পেয়েছে। কি বলিস?

শরৎ। সে আবার বলতে?

রাজু। তুই খুসী হয়েছিস্।

শরৎ। খু....উ....ব।

[উচ্চ হাসিতে মুখর হয়ে, আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায় দুই বন্ধু। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যন্ত্র সঙ্গীতের মূর্ছনা জাগে। মঞ্চ ঘোরে।]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। সামতাবেড়ে রূপনারায়ণের ধারে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখ ভাগ। টালির চালের দোতলা বাড়ির সামনে বারান্দা। পাশে বেড়া দেওয়া বাগানের একাংশ। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে বৃদ্ধ শরৎচন্দ্র একটা বই পড়ছেন। গায়ে হাফহাতা ফতুয়া। সময় সকাল। পাখীর কুজনে শান্ত গ্রামখানিতে মিষ্টি পরিবেশ রচনা হয়েছে। হাঁক পাড়তে পাড়তে একজন ফেরিওয়ালা এগিয়ে আসে,— "আলু চাই, আলু"। ফেরিওয়ালাটা বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে হাঁকতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র বই থেকে মুখ তোলেন। তাঁকে তাকাতে দেখে, আলুওয়ালা হেসে কথা বলে।]

আলুওয়ালা। বাবু, আলু নেবেন?

শরৎ। আলু নেবেন? আমার বাড়ী ছাড়া কি তোমার আলু বিক্রী করবার আর জায়গা নেই।

আলুওয়ালা। না বাবু, জায়গা অনেক আছে। তবে এ অঞ্চলে সবাই বলে, শরৎবাবুর মত মানুষ হয় না। তাই—

[শরৎ মোক্ষদাকে ডাকেন।]

শরৎ। বড় বৌ,—ও বড় বৌ। বড় বৌ শুনছো।

[ভিতর থেকে মোক্ষদা সাড়া দেয়—"যাচ্ছি গো"। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মোক্ষদা বেরিয়ে আসে। মোক্ষদার চেহারায় বয়োবৃদ্ধির ছাপ স্পষ্ট।]

মোক্ষদা। কি হোল ? সকাল বেলায় চেঁচাতে শুরু করলে কেন ?

শরৎ। আলু নেবে ?

মোক্ষদা। কেন ?

শরৎ। কেন আবার ? রান্না করে খাবার জন্যে।

মোক্ষদা। না।

শরৎ। আহা, নাওনা। মানুষটা বাড়ী বয়ে বেচতে এসেছে।

মোক্ষদা। বেচতে এলেই নিতে হবে ?

শরৎ। আহা, নাওনা। আলু তো আর পচবে না।

মোক্ষদা। তবে নাও। তোমায় নিয়ে আর পারি না। দরকার নেই—তবু। কই নিয়ে এসো আলুওলা।

আলুওয়ালা। এই যাই মা।

[একটা বস্তা পিঠে করে আলুওয়ালা বারান্দায় উঠে দাঁড়ায়।]

শরৎ। এসো আলুওয়ালা। আমি তোমারই জন্য বারান্দায় বসেছিলাম।

আলুওয়ালা। জানি বাবু। কাল সন্ধ্যেবেলায়—

শরৎ। হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যেবেলায় একজন এসে বলে গিয়েছিল, আজ তুমি আসবে।

আলুওয়ালা। আপনার দয়ার সীমা নেই বাবু। আপনাদের মত

দু'চারজন মানুষ দেশে আছেন। তাই আমরা আলু বিক্রী করে বেঁচে আছি।

শরৎ। এ-বেলায় কিন্তু এখান থেকে না খেয়ে যাওয়া চলবে না আলুওয়ালা—।

আলুওয়ালা। সে তো নিশ্চয়ই। শরৎবাবুর বাড়ীতে এসে মা জননীর হাতের রান্না খেয়ে না গেলে চলে!

মোক্ষদা। আস্পদ্দার কথা শোন একবার। বিক্রী করতে এসেছ আলু। আর এমন ভাবে কথা বলছ, যেন বাবুর বড় কুটুম—

আলুওয়ালা। আলুওয়ালার কি আর কুটুম থাকতে নেই, মা জননী?

[হঠাৎ আলুওয়ালা মাথার পাগড়ী আর মুখের ওপর থেকে বিরাট গোঁফটা তুলে ফেলে। মোক্ষদা চমকে ওঠে।]

মোক্ষদা। ওমা! এ কে গো?

[হো হো করে হেসে ওঠেন শরৎ।]

শরৎ। বিখ্যাত আলুওয়ালা, এবং তোমার মামাশ্বশুর শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়। যাহাকে বৃটিশ সরকারের পুলিশ অফিসারেরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যাহাকে ধরিতে পারিলে সরকার এখনই ফাঁসী-কাঠে ঝোলাইবে।

মোক্ষদা। ও-মাঃ গো।

[এক গলা ঘোমটা টেনে অন্দরে ছুটে যায় মোক্ষদা। হেসে শরৎচন্দ্র বলেন।]

শরৎ। বোস আলুওয়ালা। তামাক খাও।

[তাড়াতাড়ি আলুওয়ালা পাগড়ী ও গোঁফ লাগিয়ে নেয়।]

আলুওয়ালা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। বাবুর সামনে বসে, আলুওয়ালা তামাক খেতে পারে?

শরৎ। তা তো বটে! যাক, বল কি খবর?

আলুওয়ালা। তোমার কাছে আজ একটা জিনিষ গচ্ছিত রেখে যাব। চমকে উঠো না যেন।

শরৎ। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর কাজে মহামান্য বৃটিশ সরকারের পিলে চমকে যাচ্ছে, আর আমি—

আলুওয়ালা। চুপ কর। তুমি বড় বেশী কথা বলো। এইটা রাখো।

[বস্তা থেকে একটা পিস্তল বার করে শরতের হাতে দেয়। শরৎ তাড়াতাড়ি সেটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে "বড় বৌ, বড় বৌ, আলু নেবেত্তো"—করতে করতে ভিতরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।]

শরৎ। এসো আলুওয়ালা, ভিতরে এস।

আলুওয়ালা। একশ'টা টাকা না হলে কিন্তু আজ চলবে না।

শরৎ। ঠিক আছেরে বাবা, এসো না।

[দুজনে ভিতরে যায়। বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায় দিলীপ কুমার রায়। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরনে।]

দিলীপ। শরৎদা বাড়ী আছেন?

[ভিতর থেকে সাড়া দেয় শরৎ "কে দাঁড়াও যাচ্ছি"। বেরিয়ে আসে শরৎ।]

শরৎ। আরে! আজ আমার কি সৌভাগ্য। দেশবরেণ্য ডি. এল. রায়ের ছেলে দিলীপ কুমার রায় সশরীরে আমার এই পল্লীগ্রামের কুটিরে এসে হাজির।

[কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে দিলীপ।]

দিলীপ। না এসে আর উপায় আছে? শুনলাম শরীর খারাপ। কি হয়েছে?

শরৎ। কি আর হবে? বার্দ্ধক্যে দেহ জরজর। এইবার পটল তুললেই হয় আর কী?

দিলীপ। তা আর তুলবেন না? আপনার কাজই তো ওই—গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।

শরৎ। ও কথা কেন বলছ দিলীপ?

দিলীপ। আজ দেশবন্ধু নেই। সুভাষ চন্দ্র জেলে। বাংলাদেশ প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায়। আর আপনি সব ছেড়ে ছুড়ে বছরের পর বছর গ্রামে এসে বসে আছেন।

শরৎ। দেশবন্ধু আর সুভাষের সঙ্গে আমার তুলনা করো না দিলীপ। দেশবন্ধু আমাকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করে দিয়েছিলেন—আমি হয়েছিলাম। তাঁর চোখ দিয়ে দেশকে দেখেছি, কিন্তু তাঁর মত করে দেশকে ভালবাসতে পারিনি। কোথায় পাব ওই ত্যাগ, ওই সাহস? তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি, ঝগড়া করেছি,

দেশে দেশে ঘুরেছি। কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে সব সময়েই মাথা নীচু করে থেকেছি।

দিলীপ। তাই তো আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি ছুটে এসেছি। দেশবন্ধুর আদর্শ আপনি আর সুভাষ যতখানি—

[হঠাৎ রেগে ওঠে শরৎ।]

শরৎ। ও সব কথা থাক মন্টু। বাংলাদেশের লোকের মুখে চিত্তরঞ্জনের নাম শুনলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। দেশবন্ধুর জন্য আজকের এই কাঁদুনি ভণ্ডামীরই নামান্তর।

দিলীপ। কি বলছেন দাদা ?

শরৎ। ঠিক বলছি মন্টু। কাঁদতে কাঁদতে যখন তিনি সকলের দরজায় দরজায় ঘুরেছিলেন—সেদিন তো তাঁর সঙ্গে আমরা কাঁদিনি ? হাত ধরে বলিনি তো তাঁকে—ওগো, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি। আমরা তোমাকে চাই। আমরা শুধু তোমারি। তাইতো তিনি শোধ নিয়েছেন! আজ কেঁদে কেঁদে দেশবন্ধুর স্মৃতি সভা করছি! But we did not deserve him, মন্ট—we did not deserve him !

দিলীপ। দাদা! আপনি চুপ করুন।

[তীরের বেগে ভিতর থেকে প্রবেশ করে আলুওয়ালা।]

আলুওয়ালা। কেন চুপ করবে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য করতে হবে না ? "পথের দাবী"র লেখক শরৎচন্দ্র, ইনিয়ে বিনিয়ে স্মৃতিসভায় বক্তৃতা করতে যাবে ?

দিলীপ। কে আপনি?

আলুওয়ালা। আমি যেই হই। আমি তোমাকে চিনি। ডি, এল, রায়ের ছেলে তুমি দিলীপ রায়—বক্তৃতা করে স্বরাজ আনবার চেষ্টা না করে, তোমার দাদার লেখা "পথের দাবী"টা। আর একবার ভাল করে পড়ো।

দিলীপ। "পথের দাবী" বাজারে পাওয়া যায় না। গভর্ণমেন্ট ওই বই প্রোসক্রাইবড্ করে দিয়েছে। সে খবর কি রাখেন?

আলুওয়ালা। রাখি বই কি? এমন একখানা বই,—যার দাম মাত্র তিন টাকা, অথচ বিক্রী হয় একশ টাকায়। বাজারে যে বই পাওয়া যায় না,—ছাপাখানায় যে বই ছাপা হয় না। অথচ লক্ষ লক্ষ হাতে লেখা কপি ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পর্যন্ত যতগুলো বিপ্লবী ধরা পড়েছে তোমাদের বৃটিশ সরকারের পুলিশের হাতে,—তাদের কাছে আর কিছু পাওয়া যাক্ আর না যাক্—একটা করে গীতা, আর একটা করে "পথের দাবী" পাওয়া গেছে।

দিলীপ। আপনি কে? কে আপনি?

[তার কথার উত্তর না দিয়ে আলুওয়ালা বস্তা কাঁধে ফেলে হাঁটা দেয়। কণ্ঠে তার, আলু চাই—চাই আলু—।]

দিলীপ। লোকটা কে দাদা?

শরৎ। আলুওয়ালা। মণ্টু, তুমি ভিতরে যাও। তোমার বৌদি তোমাকে দেখলে খুব খুশী হবেন।

[আশ্চর্য হয়ে মণ্টু ধীরে ধীরে ভিতরে যায়। শরৎ একমনে টেবিলে লিখতে থাকে। বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালেন,—হুঁকো হাতে সমাজপতি জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী। বয়স প্রায় ষাট।]

জ্ঞানেন্দ্র। শরৎ বাড়ী আছ?

[শরৎ মুখ তুলে দেখে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে।]

শরৎ। আরে আসুন, আসুন চৌধুরী মশাই। কি সৌভাগ্য আমার। গরীবের কুটিরে আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো পড়লো।

জ্ঞানেন্দ্র। না এসে থাকতে পারলাম না, ভায়া। ধর্মের নিয়মে সমাজ চলে। ক্ষমা ত মানুষেরই ধর্ম। বুঝলে কি না? আরে তুমিতো শিক্ষিত মানুষ, বই-টই লেখো। ছেলে ছোকরারা বলে কলকাতায় নাকি তোমার অনেক নাম ডাক। তাই একবার এলাম।

শরৎ। আদেশ করুন চৌধুরী মশাই।

জ্ঞানেন্দ্র। বলছিলাম যে, তুমিও তো এখন সামতাবেড়ের মানুষ হয়ে গেছো হে। এখানকার সুখ দুঃখের ভাগ তো তোমাকেও নিতে হবে।

শরৎ। সে তো নিশ্চয়ই। গাঁয়ে বাস করবো আর গাঁয়ের সুখ দুঃখের ভাগ নেবো না?

জ্ঞানেন্দ্র। বাঃ! বাঃ। এই তো শিক্ষার গুণ। আমিও তো তাই বলি,—আরে বাপু, আকাশের চাঁদেও কলংক আছে। আমাদের শরৎচন্দ্রের জীবনেও না হয় একটু কলংক রয়েই গেল। তাতে হয়েছে কি?

শরৎ। আর একটু পরিষ্কার করে বলুন, চৌধুরী মশাই।

জ্ঞানেন্দ্র। আরে,—তোমার ওই—মানে—তোমার সঙ্গে যিনি থাকেন, সেই মেয়েটি আর কী—

শরৎ। আমার স্ত্রী!

জ্ঞানেন্দ্র। ওই হোল! বিয়ে না হলে কি আর স্ত্রী হয় না? নারী মাত্রেই তো স্ত্রীলোক। ভুল ত্রুটি মানুষই করে থাকে। আবার মানুষই সেই ভুল সংশোধন করে। সৎ ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য প্রায়শ্চিত্তির করিয়ে জাতে তুলে নিলেই হোল।

শরৎ। আমি কিন্তু এখনো ব্যাপারটা বুঝলাম না, চৌধুরী মশাই।

জ্ঞানেন্দ্র। এ তো জলের মত পরিষ্কার ভাষা। দুশোটা টাকা পানিত্রাসের ইস্কুলের জন্য দিয়ে দাও। সমাজ তোমায় জাতে তুলে নিক।

শরৎ। এটা কি আমার জরিমানা?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে ওই হোল। লঘু অপরাধে, লঘু দণ্ড। জরিমানা না দিলে কি প্রায়শ্চিত্তির হয়?

শরৎ। আচ্ছা, আমার সত্যিকারের দোষটা কি বলতে পারেন?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে রাম রাম। কি যে বলো, দোষ কি তোমার? দোষ হচ্ছে বয়সের! আমি তো ঐসব গল্পো-টল্পো পড়ি না। ছেলে ছোকরারা পড়ে। তারাই বলে—

শরৎ। কি বলে তারা?

জ্ঞানেন্দ্র। আরে তুমি তো নিজেই লিখেছ,—যে বয়সকালে বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে রাজলক্ষী না কি, একটা বেশ্যা মেয়েছেলের সঙ্গে তোমার ইয়ে হয়েছিল। তারপর সেইটাকে ঘরে নিয়ে এসে একসঙ্গে রয়েছ। তারপরে গিয়ে, সেই মেয়েছেলেটা যে ব্রাহ্মণ তারও কোন প্রমাণ নেই।

শরৎ। আমি নিজেই লিখেছি যে রাজলক্ষীর সঙ্গে আমার ইয়ে হ'য়েছিল, তারপর তাকে নিয়ে একসঙ্গে রয়েছি?

জ্ঞানেন্দ্র। ছেলেরা তো তাই বলছে।

শরৎ। বেরিয়ে যান।

জ্ঞানেন্দ্র। কি বললে?

শরৎ। আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।

জ্ঞানেন্দ্র। তুমি কি আমাকে অপমান করছো?

শরৎ। করছি।

জ্ঞানেন্দ্র। ওঃ! করছো? আমাকে অপমান করছো? তুমি কি জানো? পানিত্রাস, গোবিন্দপুর, বড়াবাড়, সামতা, মেল্লোক—এই পাঁচখানা গ্রামের আমি সমাজপতি?

শরৎ। জানি।

জ্ঞানেন্দ্র। তাও তুমি আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছ,—এ্যা ? দু'শো টাকা দিলে তুমি জাতে উঠতে পারতে—সেটা একবার—

[শরৎ চেঁচিয়ে ওঠে।]

শরৎ। বেরিয়ে যান। ইস্কুলের উন্নতির জন্য দু'হাজার টাকা দিতেও আমি রাজি ছিলাম। কিন্তু জাতে উঠবার জন্য, একটা পয়সাও আমি দেব না।

জ্ঞানেন্দ্র। চেঁচিও না শরৎ। আমি কি কি করবো, সেইটে একটু শুনে নাও। এক নম্বর—তোমার নামে ফৌজদারী মামলা করবো। দুই নম্বর—লোকজন দিয়ে দিনরাত্তির অপমান করে করে, তোমাকে দেশ থেকে তাড়াবো। তিন নম্বর—

[শরৎ চেঁচিয়ে ওঠে।]

শরৎ। ভোলা—

জ্ঞানেন্দ্র। থাম, থাম! তুমি শহরের রাজা। আর পানিত্রাস, গোবিন্দপুর, বড়াবাড়, সামতা, মেল্লোক—এই পঞ্চ গ্রামের রাজা আমি।

[হিংস্র কুটিলতায় জ্বলে ওঠে জ্ঞানেন্দ্র রায়চৌধুরীর চোখ দুটো।]

চলি। শরৎ ভায়া, ওই তিন নম্বরটা হচ্ছে,—তোমার আমি সর্বনাশ করবো।

[হাসতে হাসতে চলে যায় জ্ঞানেন্দ্র নাথ। অবাক বিস্ময়ে শরৎ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চীৎকার করে উঠে।]

শরৎ। বড় বৌ, বড় বৌ ?

[ছুটে আসে দিলীপ ও মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। কি হলো ? চীৎকার করছ কেন ?

শরৎ। আমি একটু বেরুচ্ছি।

মোক্ষদা। সে কী। এত বেলা হোল। একে তো তোমার শরীর খারাপ। এখন আবার কোথায় চললে ?

শরৎ। হরি পাখিরার বাড়ী।

[ভিতর থেকে লাঠি আর চাদরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কেঁদে ওঠে মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। গ্রামে থাকলে এই মানুষটাকে আমি আর বাঁচাতে পারবো না মণ্টু। শিশুর মতো সরল মানুষটা গাঁয়ের লোকের তো কোন ক্ষতি করেনি। তবে কেন সকলে ওর পিছনে লাগে! তুমি ওকে যেমন করে হোক রাজী করাও মণ্টু। আমরা কলকাতার বাড়ীতে চলে যাবো। বলো মণ্টু, তোমার দাদাকে তুমি রাজী করাতে পারবে তো ? ওই মানুষটা ছাড়া, আমার যে আর কেউ নেই ভাই—

[ক্রন্দনরতা মোক্ষদা ও হতবুদ্ধি দিলীপকে নিয়ে মঞ্চ ঘোরে।]

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

[শিবতলার মাঠ। পাশেই রূপনারায়ণের বাঁধের কোল ঘেঁসে বয়ে চলেছে বিরামপুরের খাল। চৈত্রের বিকাল। রোদের তেজ যেন মরেও মরতে চায় না। একটা ছায়া মতন জায়গা দেখে কয়েকখানা চেয়ার পেতে বসে আছেন পঞ্চ গ্রামের সমাজপতি জ্ঞানেন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার মোহিনী ঘোষাল। পাশে দাঁড়িয়ে কেষ্ট বাগ আর দুর্লভ মণ্ডল। জাতিতে রাজবংশী। শিবের গাজনে যোগ দেবার জন্য তারা সন্ন্যাস নিয়েছে। কি একটা মুখরোচক রসিকতায় উচ্চ হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে উপস্থিত সকলে।]

জ্ঞানেন্দ্র। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। বুঝলে না মোহিনী? সামতাবেড়ে গিয়ে আমি নিজে সব শুনে এলাম যে।

মোহিনী। তোমার যেমন কাণ্ড। তুমি আবার ছুটেছিলে সামতাবেড়ে খবর জানবার জন্য। আমি আগেই জানতাম ও লোকটা হামবাগ।

জ্ঞানেন্দ্র। দেখতে হবে না? দৌড়টা দেখতে হবে না? পঞ্চগ্রামের ছোটলোকগুলো তো শরৎ চাটুজ্জ্যের কথায় একেবারে পাগোল। কই ঠেকালে না তোদের দাদাঠাকুর? গোলমালের ভয়ে সকাল বেলাতেই গ্রাম ছেড়ে হাওয়া।

[রসিয়ে রসিয়ে হাসতে থাকেন জ্ঞানেন্দ্র।]

মোহিনী। কি রে দুর্লভ, এ তল্লাটে এত পুলিশ কোনদিন দেখেছিস ?

দুর্লভ। না কর্ত্তা। বাপের জন্মে এমন দেখিনি। চারিদিকে একেবারে লাল পাগড়ীতে ছেয়ে রয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। এর নাম ১৪৪ ধারা। কই কেউ আসুক দিকিনি শিবতলার মাঠে। শিবের গাজন একেবারে ইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে ছেড়ে দেবে না ?

কেষ্ট। তাও তো আমি বলেছিলাম বাবু। আমাকে আর দুর্লভ দাদাকে গাজনে নাও। আমরা সব গোলমাল মিটিয়ে দেব। কি গো দুর্লভদা, বলিনি ?

দুর্লভ। বললে কি হবে ? সে শোনবার পাত্তর কি ওরা ? ওই শালা পানিত্রাসের হরি পাথিরা। শালা কি কম শয়তান।

কেষ্ট। বলে, আমাদের দাদাঠাকুর আছে। গাজন হয় কি না হয় দেখে নেবো। দেখলি নে ? শালা পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ। নে, কর এখন গাজন।

[বাগনান থানার দারোগা প্রবেশ করে। সঙ্গে একজন সিপাই।]

দারোগা। কই মোহিনীবাবু কই ?

[মোহিনী ও জ্ঞানেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।]

মোহিনী/জ্ঞানেন্দ্র। আসুন। আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক, দারোগা বাবু।

দারোগা। সব ঘুরে টুরে দেখে এলাম মোহিনীবাবু। ভয়ে একেবারে সব সিঁটিয়ে আছে।

[সকলে হেসে ওঠে।]

জ্ঞানেন্দ্র। পানিত্রাসের হরি পাখিরা, শালা বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে। ওই শালাই তো—

দারোগা। থামুন, থামুন চৌধুরী মশাই। অত ব্যস্ত হবেন না। হরি পাখিরা, না কি যেন নাম বললেন ?

মোহিনী। আজ্ঞে হ্যাঁ। হরি পাখিরা।

জ্ঞানেন্দ্র। পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দারোগা। সিপাই।

সিপাই। হুজুর।

দারোগা। যো আদমীকো পাকাড়কে লে আয়া হ্যায়, উসকো লে আও।

[স্যালুট করে প্রস্থান করে সিপাই। পরক্ষণেই হরিকে এনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সকলে হেসে ওঠে। প্রচণ্ড মারের দাগ হরির সর্বাঙ্গে।]

দারোগা। এই লোকটার নামই কি হরি পাখিরা ?

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ! ধন্বন্তরি, একেবারে ধন্বন্তরি। একেবারে জঙ্গল থেকে খাঁটী বাঘটাকেই ধরে এনেছেন। সেই সঙ্গে যদি এ শালার মুরুব্বিটাকেও—

[আবার হেসে ওঠে সকলে।]

দারোগা। সবুর! সবুর! সবুরে মেওয়া ফলে।

[এগিয়ে গিয়ে হরির ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে চুল ধরে টেনে তোলে।]

কি? বাবা পাখিরা, বলতো বাবা আর কে কে ছিল তোমাদের দলে?

হরি। কয়টা লোকের নাম বলবো দারোগা বাবু। পাঁচখানা গাঁয়ের সব গরীব লোকই ছিলো আমাদের দলে—

দারোগা। চুপ শালা।

[এক ঘুষিতে তাকে ফেলে দেয় দারোগা। হিংস্র বাঘের মত ফুঁসতে থাকে হরি। তার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। হাত দিয়ে মুছে ফেলে।]

জ্ঞানেন্দ্র। আহা! আহা! বড্ড লাগছে, না বাবা হরি? শালা, সাপের পাঁচ পা দেখেছিলি যে একেবারে। বলি তোদের কর্ত্তাটি কোথায় গেল। দাদাঠাকুর? সকাল থেকেই তো গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি।

হরি। গা ঢাকা দেবার মানুষ তিনি নন, বাবু। গরীবের বাপ মা তিনি। তাঁর কাজ, তিনি ঠিকই করছেন?

জ্ঞানেন্দ্র। গরীবের বাপ মা। গুষ্টির পিণ্ডি। দু পাতা গল্পো লিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।

মোহিনী। যা বলেছ। নিজের ঘরে বসে দাতব্য কর না, বাবা। কে তোকে ঠেকাচ্ছে।

[সকলে হেসে ওঠে।]

জ্ঞানেন্দ্র। তা হলে দারোগা বাবু। উলুবেড়ের এস, ডি, ও সাহেব তো আপনাকে বলেই দিয়েছেন যে জমিটা মোহিনী ঘোষালের খাস। ওখানে শিবের গাজন, অথবা কালী কেত্তন, কিছুই চলবে না। তা সে ছোটলোকেরা যত গোলামালই করুক—

দারোগা। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন চৌধুরী মশাই। ছোটলোকদের কি করে টিট করতে হয়, তা আমি জানি। আমার সঙ্গে আছে কুড়িটা কনেষ্টবল। তাছাড়া হাঙ্গামার গুরুত্ব জানিয়ে এস, ডি, পি, ও সাহেবকেও খবর পাঠিয়েছি। তিনি তাঁর ফোর্স নিয়ে এলেন বলে।

জ্ঞানেন্দ্র। উঃ! এই না হ'লে দারোগা। শালাদের ভিটেয় এবার ঘুঘু চরাবো। কি বল মোহিনী—

মোহিনী। তা আর বলতে। দুর্লভ, দারোগাবাবুর আর বড় পুলিশ সাহেবের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক মত করবি।

দুর্লভ। সে ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে বাবু। বড় পুকুরে জাল ফেলে এক মণ মাছ ধরেছি। আর দুটো খাসি কেটেছি।

দারোগা। বল কি হে, এযে রাজভোগের ব্যবস্থা।

জ্ঞানেন্দ্র। রাজকর্মচারী আপনারা। আপনাদের ভোগের ব্যবস্থা যদি রাজার মত না হয়—ওরে, ও কেষ্ট, দাঁড়িয়ে আছিস কেন বাবা, যা না দারোগাবাবুর জলখাবারের ব্যবস্থা কর—

[হঠাৎ দূরে বহুলোকের গোলমাল শোনা যায়, সকলে উৎকর্ণ হয়।]

মোহিনী। গ্যাখতো দুর্লভ, গোলমাল কিসের ?

[দুর্লভ ছুটে যায়, গোলমাল বাড়তে থাকে। সকলে উতলা হয়। ছুটতে ছুটতে আসে দুর্লভ।]

দুর্লভ। শরৎবাবু আসছেন। সঙ্গে অনেক লোক।

জ্ঞানেন্দ্র। লোক মানে ? কোন লোক ?

দুর্লভ। আজ্ঞে, আমাদের গাঁয়ের লোক। পুলিসের ভয়ে যারা এতক্ষণ লুকিয়েছিল, তারা সব এবার দলে দলে আসছে।

[বলেই দুর্লভ আবার ছোটে।]

জ্ঞানেন্দ্র। দারোগাবাবু, আপনার পুলিসরা সব ঠিক আছে তো ?

মোহিনী। দরকার হলে আরও পুলিস আনান। টাকার জন্য ভাববেন না।

দারোগা। দেখা যাক কি হয়। লোক বেশি হলে মুশকীল হবে। সদর থেকে তো এখনো সাহায্য এসে পৌঁছল না।

[গোলমাল বেড়েই চলে, দ্রুত আবার আসে দুর্লভ।]

দুর্লভ। অনেক পুলিস আসছে, রাস্তা ধুলোয় ধুলোয় একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে।

[সকলে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে।]

দারোগা। ফোর্স এসে গেছে। আর পরোয়া করি না।

মোহিনী। উঃ, এই নাহলে ইংরেজ রাজত্ব !

জ্ঞানেন্দ্র। এইবার, কোথায় যাবে বাছাধনেরা। ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো না শালাদের।

দারোগা। এইবার ডাকুন আপনাদের শরৎ চাটুজ্জ্যেকে। দুখানা বই লিখে একেবারে দুনিয়া জয় করে—

[হঠাৎ প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র।]

শরৎ। শরৎ চাটুজ্জ্যে আপনার সামনে হাজির দারোগাবাবু। দুখানা বই লিখে যে অপরাধ করে ফেলেছি তার জন্য মাপ করবেন।

দারোগা। ওঃ। আপনিই শরৎবাবু। বইটই লেখেন, লিখুন না, তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু হঠাৎ লোক ক্ষেপাতে শুরু করলেন কেন ?

[হঠাৎ এস, ডি, পি, ও ভুবনেশ্বরবাবু প্রবেশ করেন।]

ভুবন। মুখ সামলে কথা বলুন মিঃ দাস। আপনি জানেন, কার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন ?

[দারোগা কেঁপে উঠে স্যালুট করে।]

দারোগা। স্যার! আপনি ? এই ভদ্রলোক স্যার। অনেক লোক ক্ষেপিয়ে স্যার—

ভুবন। Shut up : লেখাপড়া শিখেছেন। নিজেকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেন। আর দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে সম্মান দেখাতে পারেন না।

দারোগা। পার্রি স্যার, আমার স্যার, ভুল হয়ে গেছে স্যার।

ভুবন। সমস্ত ফোর্স উইথড্র করে নিন। যত কনস্টবল এনেছেন, সকলকে নিয়ে পানিত্রাস ইস্কুলে আমার পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন।

দারোগা। ইয়েস স্যার!

[দরোগা স্যালুট করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে এসে শরৎকে ভাঙ্গা গলায় বলে—]

আমায় ক্ষমা করবেন স্যার।

[বলেই দ্রুত বেরিয়ে যায়। ব্যাপার স্যাপার দেখে মোহিনী, জ্ঞানেন্দ্র এবং অন্যান্যরা পালাচ্ছিল, ভুবনেশ্বরবাবু হাঁক দেন।]

ভুবন। দাঁড়ান।

[সকলে দাঁড়ায়।]

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শরৎবাবু?

শরৎ। ব্যাপার এমন কিছুই নয় ভুবনেশ্বরবাবু। এই গোবিন্দপুর গ্রামের পশ্চিমদিকে রূপনারায়ণ। ওই যে দূরে খালটা দেখছেন, ওর নাম বিরামপুরের খাল। আসল গোলমালটা বাধে এই খালের জলকর বিলি করা নিয়ে।

ভুবন। তাই বলুন। আগে থেকেই এখানে একটা গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে।

শরৎ। আজ্ঞে হাঁ। ওই যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওনার নাম মোহিনী ঘোষাল। সমস্ত গোলমালটা উনিই পাকিয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এসব মিথ্যা কথা হুজুর। মোহিনীবাবু অত্যন্ত সজ্জন।

শরৎ। সজ্জন তো বটেই। ওনার সৎ কাজের একটু নমুনা দিই ভুবেনশ্বরবাবু। এখানকার লোকেরা বিরামপুরের খালে ইচ্ছামত মাছ ধরে খেতো চিরকাল। মোহিনীবাবু কিছুদিন আগে গোবিন্দপুরের জমিদারী কিনেই প্রজাদের মাছধরা বন্ধ করে দিলেন। আর ওই খালে জলকর বিল করলেন। আসলে এটা শিবোত্তর সম্পত্তি—তাই প্রজারা প্রতিবাদ করলো।

ভুবন। ইনটারেষ্টিং তো, তারপর ?

শরৎ। দুর্লভ আর কেষ্ট নামে দুজন রাজবংশীকে হাত করে প্রজাদের নামে মিথ্যে ফৌজদারী মামলা জুড়ে দিলেন জমিদারবাবু।

ভুবন। মোহিনীবাবু, আপনি দেখছি গুরুদেব ব্যক্তি।

মোহিনী। একটুখানি ভুল বললেন শরৎবাবু। ওটা যে শিবোত্তর সম্পত্তি সেটা এখনো প্রমাণ হয়নি। দেওয়ানীতে কেস চলছে।

শরৎ। ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এই জমী থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্র। আর আপনাকে বলেছিলেন ছোটলোকগুলোকে নিয়ে এখানে মাতব্বরী করতে। কেমন ?

শরৎ। চৌধুরী মশাই। আপনি তো লেখাপড়া জানেন না। যদি জানতেন তাহলে বুঝতে পারতেন পৃথিবীর কোথাও কোনদিন ছোটলোকেরা মাতব্বরী করবার সুযোগ পায়নি। মাতব্বরী করেছেন আপনাদের মত ভদ্রলোকেরা।—

বলুন তো ভুবনেশ্বরবাবু, ওরা ভাল করে খেতে পায় না, পরতে পায় না, জাত যাবার ভয়ে এইসব সমাজপতিরা, ওদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ান না। আসছে কাল চোত সংক্রান্তি। শিবের গাজনে যোগ দেবে বলে এইসব ছোটলোকেরা সন্ন্যাস নিয়েছে। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এই শিবতলায় এরা গাজন করে আসছে। কোন আক্কেলে এইসব সমাজপতিরা, পুলিশকে হাত করে এদের গাজন বন্ধ করলেন।

[উত্তেজনায় শরৎ হাঁপাচ্ছে।]

ভুবন। শিবের গাজন বন্ধ হবে না শরৎবাবু। আপনারা আয়োজন করুন। আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে থেকে কাল গাজন পালন করবো।

শরৎ। এ্যাঁ! আপনি ঠিক বলছেন ভুবনেশ্বরবাবু? এইসব শুকনো মুখ, খেতে না পাওয়া ছোটলোকদের গাজন হবে?

জ্ঞানেন্দ্র/মোহিনী। কি বলছেন হুজুর?

ভুবন। ঠিকই বলছি। এদের ধর্মে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই।

শরৎ। ওরে কইরে তোরা। ও হরি, ও বলরাম, ওরে ও নরেন, তোরা আয়। আর ভয় নেই। পরাধীন ভারতবর্ষে ভুবনেশ্বরবাবুর মত পুলিশও আছেন। যারা শুধু হাতে দড়িই পরায় না, একটা একটা করে দড়ির বাঁধন কেটে দেশের মানুষের মুক্তি এনে দেয়—

ভুবন। এসব আপনি কি বলছেন, শরৎবাবু?

[ইতিমধ্যে গাজনের বাজনা বেজে ওঠে। চারিদিকে আনন্দ-পাগোল মানুষগুলোর চীৎকার।]

শরৎ। আমি ঠিকই—

[হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ে শরৎ। চীৎকার করে ওঠেন ভুবনেশ্বরবাবু।]

ভুবন। একী হোল আপনার?

[শরৎ শুয়ে পড়ে।]

ওহে তোমরা এদিকে এসো। এই সিপাই, খাড়া হো কর কেয়া দেখতে হো? ইধার আও।

[হরি পাখিরা, দুর্লভ, কেষ্ট, সিপাই ছুটে এসে শরৎকে ধরে। বাজনা থেমে যায়।]

ভুবন। কি হোল? শরৎবাবু কি হোল আপনার?

শরৎ। যন্ত্রণা। আর বাঁচবো না ভুবনেশ্বরবাবু। অনেকদিন থেকেই দেহটা আর চলছে না।

হরি। আপনি এই গাঁয়ে পড়ে আছেন কেন? ডাক্তার নেই, বদ্যি নেই। আপনার চিকিচ্ছে হয় না—

শরৎ। ডাক্তারে আর কিছু করতে পারবে না হরি। একী! বাজনা থামলো কেন? আজ বাদে কাল গাজন, শুকনো মুখের মানুষগুলোকে জিতিয়ে দিলেন ভুবনেশ্বরবাবু। আজ যদি আনন্দ না করিস, তবে আর কবে করবি হতভাগারা—

[আবার বাজনা ও চীৎকার।]

ভুবন। আপনি বেশী কথা বলবেন না। চলো হে সব, ওনাকে বাড়ী নিয়ে চলো—

[সকলে শরৎকে ধরে নিয়ে এগোয়। শরৎ হঠাৎ থেমে যায়।]

শরৎ। হরি, এত আনন্দ ফেলে তুই আমায় কলকাতায় যেতে বলছিস হরি। ওরে—কলকাতায় গাজন হয় না, কলকাতায় বাঁধ নিয়ে মারামারি হয় না—কলকাতায় এমন করে পাখী ডাকে না, কলকাতায় এমন কাঁচের মত জল নিয়ে আমার রূপনারায়ণ বয়ে যায় না রে—

[অশ্রুসিক্ত চোখ জলতে থাকে শরতের। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজতে থাকে গাজনের বাজনা। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়।]

॥ নবম দৃশ্য ॥

[কলকাতার পার্ক নার্সিং হোম। শরৎচন্দ্রের কেবিন। কেবিনটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শরৎচন্দ্রের খাট, পাশে একটি টুল, মাথার কাছে একটি ছোট টেবিল, বিছানায় শরৎচন্দ্র শায়িত। সাদা চাদরে তার গলা পর্যন্ত ঢাকা। অপর অংশে একটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, কিছু ফাইল, আর টেলিফোন। চেয়ারে পিছন ফিরে বসে লিখছিল নার্স। মঞ্চে আলো জ্বললো গভীর স্তব্ধতার মধ্যে। টেলিফোন বেজে উঠলো। নার্স উঠে গিয়ে রিসিভার তুললো। হরিদাস চট্টোঃ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে।]

নার্স। পার্ক নার্সিং হোম। ইয়েস স্পিকিং। ওঃ, Statesman! নাঃ—নাঃ মোটামুটি। কিছু বলা যায় না। সেন্সলেস্, পরে জানাবো। রাখছি তাহলে। বাই····।

[নার্স টেবিলে গিয়ে বসে।]

হরিদাস। আচ্ছা! ঠিক কখন থেকে উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন, বলতে পারেন ?

নার্স। ভোর বেলায়।

হরিদাস। আশ্চর্য! ভালর দিকেই তো যাচ্ছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত গল্প করে গেলাম ওনার সঙ্গে।

[ঝড়ের মত প্রবেশ করেন সুরেন গাঙ্গুলী। বয়স ৫৬। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু।]

সুরেন। নার্স! কি ব্যাপার বলুনতো? হঠাৎ টেলিফোন করলেন কেন?

নার্স। অবস্থা ভাল নয়।

সুরেন। কেন? কি হয়েছে?

নার্স। ভোর থেকে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সুরেন। কি বলছেন আপনি? কাল রাত্রি পর্যন্ত দেখে গেলাম। আজকে ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার কথা।

নার্স। ভোর বেলায় আফিং-এর জল খেয়ে, বমি করতে শুরু করেন—তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

সুরেন। মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়েছে। উঃ এই মানুষটাকে নিয়েতো আর পারা গেল না। পেটে অত বড় একটা অপারেশন হোল। বার বার বলে গেলাম—মুখ দিয়ে কিছু খাবার চেষ্টা করো না—এরা নল দিয়ে খাওয়াচ্ছেন—তাই খাও।

হরিদাস। কিন্তু আপনাকেও বলি—আপনার চোখের সামনে মানুষটা মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেল, আপনি দেখলেন না?

নার্স। আমি কি করবো বলুন? উনি বালিশের তলায় লুকিয়ে আফিং-এর জল রেখে দিয়েছিলেন। আমি দেখতে পাইনি।

[সুরেন ফুঁপিয়ে ওঠে।]

সুরেন। হায় ভগবান! যা ভেবেছি ঠিক তাই। আর বাঁচাতে

পারলাম না হরিদাসবাবু। এতদিন পরে আমাদের বাড়ীতে একটু আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছিল, আজ শরৎ বাড়ী যাবে। বড়মার মুখে অনেকদিন পর একটু হাসি দেখলাম।

হরিদাস। বৌদি জানতে পারেননি তো যে শরৎদা বমি করেছে।

সুরেন। না—সে হতভাগিনী জানে—যে তার স্বামী একটু পরে বাড়ী ফিরবে।

[টেলিফোন বেজে উঠলো—নার্স ধরল।]

নার্স। পার্ক নার্সিং হোম। ইয়েস স্পিকিং। কে—রয়টার? নাঃ…অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। কিছু বলা যায় না। না। না। আচ্ছা ঠিক আছে। নিশ্চয়ই জানাবো। রাখছি তাহলে—বাই।

সুরেন। জানলেন হরিদাসবাবু—বড়মা নিজের হাতে বাইরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছেন—শরৎ গেলে শোয়াবে। আঙুরের রস তৈরী করে রেখেছে—শরৎ গেলে খাওয়াবে।

হরিদাস। আপনি এত অধীর হচ্ছেন কেন সুরেনবাবু—হয়ত It's a case of temporary set back—বাড়ী উনি ঠিকই যাবেন। তবে বৌদির মুখটা মনে পড়লে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। মানুষটা আজীবন শুধু শরৎদাকে দিয়েই গেলো। পেলে না কিছুই। সমাজ ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল। আত্মীয়স্বজন কেউ কোন দিন

স্বীকার করে নিল না। প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির মতন সমস্ত জ্বালা বুকে চেপে রেখে হাসি মুখে শুধু স্বামীর জন্যে কাজ করে গেল।

সুরেন। আপনি কিন্তু একতরফা কথা বলছেন হরিদাসবাবু। বড়মার জন্য শরতের ত্যাগের কথা—একটা নামহীনা বৈষ্ণবের মেয়েকে—যার অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে কম ত্যাগ স্বীকার করেনি।

হরিদাস। লোকচক্ষুতে গ্রহণ করেছিলেন সুরেনবাবু। কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করতে পারেন নি। আজও এই রোগশয্যায় যদি আপনি শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করেন—তার কৈশোর, যৌবন এমনকি এই বার্ধক্যে পর্যন্ত কোন্ নারী চরিত্র তার মনপ্রাণ জুড়ে আছে—শুনতে পাবেন—সে আর কেউ নয়—শান্তি নয়—মোক্ষদা নয়—সে বুড়ি—নিরুপমা।

[কিছুক্ষণ আগেই শরৎচন্দ্রের জ্ঞান ফিরেছে। পাশের ঘর থেকে তার যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি অল্প অল্প শোনা যাচ্ছিল। হরিদাসের মুখে নিরুপমার নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র চীৎকার করে ওঠে।]

শরৎ। আঃ—ঐ নামটা তোমরা কেন আবার উচ্চারণ করছ? ওই তো আমার যম, ওই তো আমার জীবন, ওই তো আমার....আমার....

[ভীষণ উত্তেজনায় শরৎচন্দ্র হাঁপাতে থাকে। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে নার্স, হরিদাস, সুরেন।]

নার্স। আপনি চুপ করুন মিঃ চ্যাটার্জী।

হরিদাস। শরৎদা আপনি কথা বলবেন না।

সুরেন। শরৎ! শরৎ!

হরিদাস। আপনি উত্তেজিত হবেন না শরৎদা—ক্ষতি হবে।

[ওরা শরৎচন্দ্রের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। নার্স শরৎচন্দ্রের মাথায় হাত রাখে।]

শরৎ। তোমরা আমায় কোনদিন বুঝতে পারনি সুরেন—তুমি বলতো হরিদাস—আমি সাহিত্যিক—আমি সমাজের নোংরা খুঁজে বের করে সকলের সামনে তুলে ধরবো অথচ নিজে নোংরা ঘাঁটবো না—এটা কি সম্ভব।

হরিদাস। আপনি চুপ করুন শরৎদা—আমরা সকলেই আপনাকে বুঝেছি।

[সুরেন কেঁদে ফেলে।]

সুরেন। সকলেই তোমাকে বুঝেছে শরৎ। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে—যতদিন বাংলা দেশ থাকবে—যতদিন বাঙ্গালী জাত থাকবে—ততদিন শরৎচন্দ্রের নাম অমর হয়ে থাকবে।

[শরৎ ভীষণ উত্তেজনায় হাঁপায়।]

শরৎ। থাকবে—তুমি বলছো সুরেন—হরিদাস—থাকবে—

[হঠাৎ শরৎচন্দ্র বমি করতে শুরু করে, বারবার বমির দমকে তার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। বিছানায় ছটোপাটি করতে থাকে সে। তার শরীর ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। স্খলিত কণ্ঠে সে চীৎকার করে ওঠে—]

আমাকে....দাও....আমাকে....আরো....দাও....আরো....আরো....আমাকে....আঃ....আঃ....

[বিকট চীৎকার করে স্তব্ধ হয়ে যায় শরৎ। মৃত্যু ততক্ষণে এ দরদী শিল্পীকে অনন্ত শান্তির জগতে নিয়ে গেছে। নার্স ছুটে বেরিয়ে যায়। প্রবেশ করে ডাক্তার। নাড়ী দেখে সাদা চাদরটা রোগীর মুখের উপর ঢাকা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে যায়। রেডিওতে ঘোষণা শোনা যায়—"অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা। আজ ১৬ই জানুয়ারী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ, রবিবার সকাল ১০ টার সময় ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরেসের পার্ক নার্সিং হোমে সর্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর ৪ মাস।"

স্তব্ধ বিমূঢ় নার্স, হরিদাস ও সুরেনের সামনে একটা একটা করে আলো নিভতে থাকে। শরৎচন্দ্রের অতি প্রিয় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ততক্ষণে দর্শকদের হৃদয় মোহিত করে বেজে চলেছে—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ওই ছায়া
ভুলালোরে ভুলালো মোর প্রাণ—"]

যবনিকা